

# সূচী

- সর্পদেবতা ও মনসা মজল
- বাংলা থিয়েটারে উন্টো হাওয়া
- ২০ দফা কর্মসূচী ও ভূমি সমস্যা
- জার্মানীর কৃষক বিপ্লবের নায়ক টমাস মুয়েনৎসার
- প্যালেস্টাইন সমস্যা ও সমাধান
- সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৫শ কংগ্রেসের দৃষ্টিতে  
জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম
- ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন ও ভারতের কমিউনিস্ট  
পার্টি—নেতৃত্বের অভিমত

১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৮৩

মূল্য : দেড় টাকা

# **PROBLEMS OF NATIONAL LIBERATION**

**A Journal of Theoretical Studies and Research**

Vol. 1

No. 2

## **Content :**

The Revolt of Titu Mir—A Communal Outburst  
or a Peasant Rising—*Narahari Kaviraj*

Miltinational Corporations—*Debkuniar Ganguly*

National Question in Darjeeling and Lessons of

Proletarian Internationalism—*Satyendra Narayan Mazumdar*

Sunderban : An Observation—*Biswanath Roy*

Some Features of Capitalism in India After 1969

—*Sankar Roy*

Questions of History of China in Lenin's Works

—*V. N. Nikiforov*

The Russian Revolution : Lessons for India ( 1905-07 )

—*K. Raj*

## **Discussion :**

Non-Capitalist Path in India : Some Implications

Book Review

## **Editors :**

**Satyendra Narayan Mazumdar**

**Narahari Kaviraj**

Price : Rs. 3/-

*To be had of :*

**Manisha Granthalaya (P.) Ltd.**

4/3B, Bankim Chatterjee Street,

Calcutta-12.

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| দ্বীপান্তরের বন্দী : নলিনী দাস                   | ১০'০০ |
| মানুষের পাখির সম্পদ : লিও হবারম্যান              | ১০'০০ |
| MAN'S WORLDLY GOODS-এর বঙ্গানুবাদ                |       |
| আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা : সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার | ১০'০০ |
| স্মৃতি বিস্মৃতি ও দূরস্মৃতি : পাবলো নেরুদা       | ১'০০  |
| ধর্ম ও মার্কসবাদ : অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র         | ২'৫০  |
| ইতিহাসের ধারা : সুশোভন সরকার                     | ৭'৫০  |



## মনীষা গ্রন্থালয়

৪১৩বি, বংকিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

## শারদীয় মূল্যায়ন

এবারেও শারদীয় মূল্যায়ন বিচিত্রভাৱে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হবে। ঊনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণ বিষয়ে বিতর্কমূলক আলোচনা, মাও সে-তুং-এর নৱা-গণতন্ত্র সম্পর্কে নতুন আলোকপাত, তৃতীয় দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনের শোষণ, ব্রিটিশ শাসনে চটকল ধর্মঘট সম্পর্কে গবেষণামূলক নিবন্ধ, জাতীয় গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সমস্যা, দীর্ঘত্বের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী সংগ্রাম, অ্যাক্সেলার বিপ্লবের তাৎপর্য, ভারতে কৃষির বিকাশ সম্পর্কে বিতর্কমূলক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা, ভারতে সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শগত আক্রমণ প্রভৃতি প্রবন্ধ স্থান পাবে এবারের শারদীয় সংখ্যায়।

এ ছাড়া সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণীয় হবে প্রগতি লেখক আন্দোলনের সমস্যা।

শারদীয় সংখ্যা মহালয়ার অনেক আগেই প্রকাশিত হবে।

এজেন্টদের সত্বর যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

# মূল্যায়ন

১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

( আষাঢ়-শ্রাবণ )

১৩৮০

## সূচী

|                                                                            | পৃ: |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| মধ্যযুগের বাংলার হিন্দু মুসলমান ।                                          |     |
| সপ'দেবতা ও মনসা মন্ত্রণ / সুকুমার মিত্র                                    | ১   |
| ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়নের পথে ভূমি সমস্যা / দেবেন দাস                      | ৭   |
| প্যালেস্টাইন সমস্যা ও তার সমাধান / কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়                   | ১৮  |
| সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৫শ কংগ্রেসের দৃষ্টিতে<br>জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম | ৩৫  |
| বাংলা বিদ্যেচোরে উল্টো হাওয়া / দিগন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়                | ৪২  |
| জার্মানীর কৃষক বিপ্লবের নায়ক টমাস মুন্থেনিংসার<br>অনুবাদ : নন্দিনী সেন    | ৫১  |
| আলোচনা                                                                     |     |
| আগস্ট আন্দোলন ( ১৯৪২ ) এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি :                       |     |
| কয়েকটি অভিমত / গঙ্গাধর অধিকারী, সি. রাজেন্দ্রর রায়, পার্টি ইতিহাস        | ৫৫  |
| এই সমালোচনা                                                                | ৬৬  |
| চিঠিপত্র                                                                   | ৭৬  |

প্রচ্ছদ : আব্দুল দাস

সম্পাদক

মতোজনারায়ণ বসুমদার

মহাবরি কবিরাজ

---

পবিত্র রায় কর্তৃক ১০ বগুলা রোড, কলিকাতা-১১ থেকে প্রকাশিত ও  
কালান্তর প্রেস, ৩৩।৬ কাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ থেকে মুদ্রিত ।

## সর্পদেবতা ও মনসামঙ্গল

সুকুমার মিত্র

মানুষ যখন অস্ত্র-জানোয়ারের চেয়ে বিশেষ উচ্চতরে ওঠে নি তখন, মানব-সভ্যতার সেই উষাকালে মানুষের সঙ্গে অস্ত্র-জানোয়ারের সম্পর্ক ছিল গভীর। অনেক অস্ত্র-জানোয়ারের নাম মানুষের বিভিন্ন কোমের (Tribe) কুল-অভিধা-রূপে (Totem) গ্রহীত হত। আবার অনেক অস্ত্র জানোয়ারের শক্তি, হিংস্রতা, ক্ষিপ্রতা মানুষের মনে আগাতো ভয় এবং সেই ভয় থেকেই আগত ভক্তি। বাঘ, সাপ প্রভৃতি ভীতিপ্রদ অস্ত্র ও সরীসৃপ এইভাবেই মানুষের ভক্তির পাত্র হয়ে উঠেছে। ব্যাঘ্রদেবতা, সর্পদেবতা ইত্যাদি নানারূপে এরা মানুষের কাছ থেকে পূজা আদায় করেছে।

জগতের প্রায় সব দেশেই সাপ আছে এবং সর্পপূজাও প্রায় সকল দেশেই নানা আকারে দেখতে পাওয়া যায়। “সর্প সব দেশেই আশ্রয় জীব। তার অন্তর্ভুক্ত আকৃতি, তীব্র বিষ, ক্ষিপ্রগতি, ছয় মাস না খাওয়া, অন্ধকারে পড়িয়া থাকি, খোলস ছাড়িয়া নবজীবন লাভ করা, দুই ভাগ করা জিহবার লকলকানি এই সবই সব দেশে বিশ্বস্ত ও পূজা আদায় করিয়া ছাড়িয়াছে।” (বাংলায় মনসাপূজা, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রবাসী, আষাঢ়, ১৯১১)।

ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই সর্পপূজা প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। সর্পপূজার উৎপত্তি সম্ভবতঃ প্রাগৈয় যুগে। তারপর বৈদিক যুগের দেবভাবনা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের লৌকিক দেবভাবনা ও কাহিনী যুক্ত হয়ে সর্পদেবতা কালক্রমে আধুনিক মনসা দেবীতে পরিণত হয়েছে। ক্ষিতিমোহন সেনের মতে বাংলা দেশে মনসাপূজা সেন বংশের রাজত্বকালে দক্ষিণ-ভারতের প্রভাবে প্রচলিত হয়। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কানাড়ী ভাষায় সর্প-দেবতাকে বলা হয় ‘মনসা আস্ত্রা’ বা ‘মনে মাকি’। এই নাম থেকেই মনসা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে ক্ষিতিমোহন সেন মনে করেন। ডঃ সুকুমার সেন এই মত গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে বৈদিক ‘মনসা’ শব্দ থেকেই কানাড়ী ‘মনসা’ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে, বর্মঠাকুর সূর্য-দেবতা হলেও প্রাগৈয় দেবভাবনাসম্পন্ন এবং এই দেবভাবনার সূর্যের সঙ্গে তাঁর

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করা হয়েছে। ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টি-পত্তন কাহিনীর সঙ্গে কথোপকথনের নাসদীয় সৃষ্টির কাহিনীর যোগ আছে। আবার নাসদীয় সৃষ্টির বর্ণনার সঙ্গে প্রাগার্য পলিনেশিয়ারের কাহিনীর যোগ আছে। “প্রাচীন মনসা-মঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই ঋগ্বেদীয় সৃষ্টি-পত্তন কাহিনীর ডাবই অনুংসৃত।” (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, জীপুসুয়ার সেন, ১৩৫৯)

তা’ হলে কোন প্রাগার্য কাহিনীর ভিত্তিতেই নাসদীয় সৃষ্টির বর্ণনার সৃষ্টি হয়েছে এমন অনুমান করা যায়। মূলে মনসার কাহিনী ঋগ্বেদীয় সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত ছিল এটা লক্ষ্য করলে স্বীকার করতেই হবে যে মনসা মূলতঃ প্রাগার্য দেবী। কাজেই কানাড়ী ভাষার ‘মন্‌সা’ থেকে ‘মনসা’ হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। ‘মনসা’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি তা’ ভাষাতত্ত্ববিদরা বলতে পারেন। তবে আমরা জানি যে, সংস্কৃত ভাষায় কিছু কিছু ভ্রাবিড় বা প্রাগার্য গোষ্ঠীর শব্দ স্থান পেয়েছে। যেমন, ‘পূজা’ শব্দটি মূলতঃ সংস্কৃত শব্দ না, ভ্রাবিড় বা প্রাগার্য গোষ্ঠীর শব্দ বলে কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন। ‘পূজা’র স্থান কানাড়ী ভাষায় ‘মনসা’ শব্দটিও সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ লাভ করে বৈদিক সংস্কৃতে নবরূপ লাভ করে থাকতে পারে।

প্রাগার্য শিব, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর সঙ্গেও মনসার যোগ ঘনিষ্ঠ।

মনসার অপর কয়েকটি নাম হল জাজুলী, বিষহরী ও পদ্মাবতী। বাংলাদেশে, নিম্নের করে পূর্ববঙ্গে নাগ ঘট বা মনসার ঘটপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ঈঃ “নারীমূর্তিতে মনসা পূজা-প্রথা প্রচলিত হইবার পূর্ববর্তী এবং প্রায় দাক্ষিণাত্যের অনুঘাটী জীবন্ত সর্পপূজার সমধর্মী...”। নাগঘট ধন বা নগ্নভাগীর প্রতীক।

মনসা-সিঙ্গ পূজাও বাংলা দেশে প্রচলিত। বৃক্ষও সর্প উর্বরতাবাদের প্রতীক। এ ছাড়া মনসা-সিঙ্গজাত সাগর সর্পবিধ নিবারক আর সর্পের শ্রীর পানীয় চূড়ের অনুরূপ বলে মনসা-সিঙ্গ সর্পের আবাসরূপে সর্পপূজার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। আসামের বোড়ো জাতির একটি শাখার মধ্যে এই সিঙ্গ-পূজা বহুদিন হইতে প্রচলিত এবং বাংলা দেশে বোড়ো জাতির এই শাখার মনসা-সিঙ্গ পূজা গৃহীত হয়েছে বলে অধ্যাপক জাতিতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন।

সর্পদেবতা বাংলাদেশে স্ত্রীকপিণী কারণ বাংলা দেশের বর্তমান সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হলেও এই সমাজের (অন্ততঃ ধর্মের ক্ষেত্রে) মূল কাঠামো এখনও মাতৃতান্ত্রিক। কালী, দুর্গা প্রভৃতি স্ত্রীদেবতাদের প্রাধান্যই এর প্রমাণ।

স্রাব্ধভ্যাবী জাতিগুলির সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক এবং এখনও দাক্ষিণাত্যে এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব বর্তমান। কর্ণাটে সর্পদেবতা সুনামা ও মনে মকান্দা, অন্ধ্রদেশে নাগন্দা বা বালনাগন্দা, উড়িষ্যায় বিরাট পাট্টাকুরাণী বা পিবিদেন্দুরী এবং আসামে খাসিরা অঞ্চলে খেলন। এরা সকলেই নারী দেবতা।

এটাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, ওরাও, হো, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে 'মনসা' নামটি সুপরিচিত। দ্বীপীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বাংলা দেশে মা মনসার মাহাত্ম্য পাঁচালীতে প্রচারিত হতে থাকে। বাংলা দেশের মনসা পূজার দক্ষিণ ভারতের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। উত্তর ভারতের প্রতীক সর্পপূজার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের জীবিত সর্প পূজার কোন যোগ আছে কিনা জানি না, কিন্তু বাংলা দেশে প্রতীক সর্পপূজা প্রচলিত থাকলেও জীবিত সর্পের (বাস্তু সাপ) মান কম নয়। এ ছাড়া দক্ষিণ ভারতের প্রচলিত কাহিনী ও পূজা পদ্ধতির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রচলিত কাহিনী ও পূজা-পদ্ধতির মিল উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চাঁদ সওদাগর গৌড়া শৈব, বাংলা দেশে এই রকম গৌড়া শৈব কখনও ছিল কিনা সন্দেহ। কাজেই ক্ষতিমোহন সেন মনসা মঙ্গলের মূল কাহিনী ও চরিত্রগুলি (বিশেষ করে চাঁদো ও বেহুলা) দক্ষিণ ভারতের কাহিনী থেকে গ্রহীত বলে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের যোগ বেশী ছিল বলেই মনে হয়। জীবিত সর্পপূজার অবশেষ পশ্চিমবঙ্গে নেই, কিন্তু পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) আছে বা ছিল। কেবালা প্রভৃতি প্রদেশের 'চার গ্রহেশ্বর বাড়ীর সংস্কার স্থানে সর্পের বাসস্থান বা মনসা-খোলা রাখার রীতি বিরশাল, নোয়াখালি, চাঁদপুর, ফরিদপুর ও ঢাকায় অনেক আছে (বা বেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত ছিল)। অবশ্য উত্তর ও পূর্ব ভারতের প্রভাবও বঙ্গভূমির উপর কম পড়ে নি। এইভাবেই বাংলাদেশের মনসা পূজা ও মনসামঙ্গল বিচিত্ররূপ লাভ করেছে।

সর্পভীতি যেটো খাওয়া নাধারণ মানুষেরই বেশী হওয়ার কথা, কারণ বনে-জঙ্গলে কাঠ কাঠতে, খালবিলা ও নদীতে মাছ ধরতে এবং জমিতে চাষ করতে গিয়ে সাপের সম্মুখীন হওয়ার ভয় সদা সর্বদাই থাকে। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও উভয় বঙ্গে সাপে কাটা মানুষের মৃত্যু সংখ্যা কম নয়।

কি শ্রোগার্হ, কি বৈদিক আর কি মধ্য যুগ—সকল যুগেই সর্পদেবতা সর্প রূপেই হোক আর সর্প জগতের একচ্ছত্র অধিষ্ঠাত্রী মনসা মাতা রূপেই হোক—সাধারণ মানুষেরই পূজা পেয়ে এসেছেন। উচ্চ কোটির মানুষ এই পূজাকে অনেকটা অবজ্ঞায় চক্ষেই দেখেছে। চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন বাস একাণ্ড আশাভরেই লিখেছেন :

নতু কসি বিষহরি পূজে কোনজন...

পুতুলী করার কেহ দিয়া নানা ধন।

পঞ্চদশ শতকে বৃন্দাবন বাস শ্রীচৈতন্যের ভক্তিমার্গ আশ্রয় করে এইরূপ মতব্য করলেও তুর্কী আক্রমণের পর উচ্চকোটির হিন্দুদের পক্ষে নিম্নকোটির মানুষদের এড়িয়ে চলা কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাঁরা বুকেছিলেন যে, নিম্নকোটির অবজ্ঞাত মানুষদের কাছে টেনে আনতে না পারলে ভবিষ্যতে তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণদের পূজা-অর্চনা, আচার-বিচার, মূর্তি পূজার অঙ্কুর জনসাধারণকে প্রভাবিত করলেও তাদের লৌকিক দেবদেবী, আচার-অনুষ্ঠান তারা পরিত্যাগ করতে পারল না। বরং, তারা উচ্চকোটির অনুসরণে আরও জটিলকর্মের সঙ্গে তাদের আরাধা দেবতাদের পূজা করতে শুরু করল। উচ্চকোটির বর্ণহিন্দু, বিশেষ করে ব্রাহ্মণরা এতে কিছুটা উৎসাহও দিলেন এবং সংকৃত মতাদর্শ রচনা করে ও পূজার্ননার বিধি প্রণয়ন করে তাঁরা লৌকিক দেবদেবীদের আঁতে তুলতে শুরু করলেন। এইভাবেই মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতির পূজা পঞ্চদশ শতকের মধ্যে সমগ্র বঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। তবে এ কথাও ঠিক যে, ব্রাহ্মণ তথা উচ্চকোটির মানুষেরা বেশী দূর অগ্রসর হতে চান নি, কাজেই মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি জনসাধারণের দেবতার। উচ্চবর্ণ-পুঞ্জিত ভদ্র দেব-সমাজের বাইরেই রয়ে গেলেন। নিম্নকোটির সাধারণ মানুষ ও উচ্চবর্ণের লোকেরা তাদের দেবতাদের মনে নিচ্ছে দেখে হুসী হলেও খুব বেশী মাথামাখি করতে রাজী হও নি। এ ব্যাপারে নিজেদের পূজাধিকার রীতিনীতি ইত্যাদি রক্ষার প্রয়াস জড়িত ছিল।

আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। বিদেশাগত ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের আক্রমণে প্রথম দিকে বাংলা দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ বিমূঢ় হয়ে গেলেও উচ্চকোটির মানুষেরা রাজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করে সহজেই নিজেদের সামলে নিতে পেরেছিলেন। অনেকে দেশান্তরে গিয়ে আশ্রয়লাভ করেছিলেন। নিম্নকোটির অসংখ্য মানুষের মনে রাজশক্তির পরিবর্তন

বিশেষ কোন রেখাপাত করে নি। রাজশক্তির পরিবর্তন ভারতীয় সমাজে কখনই আলোড়ন তোলে নি।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-জীবনের সংকীর্ণ গভীর বাইরে দৃষ্টিপাত করার সামর্থ্য তাদের ছিল না। রাজশক্তির পরিবর্তনে তাহাদের কিছু যেত-আমত না। তথাপি প্রথমদিকে ইসলাম-ধর্ম প্রচারে অতি উৎসাহী তুর্কীরা যখন দলে দলে হানা দিতে লাগল তখন তাদের চিত্রাচারিত জীবন-যাত্রা অনেক পরিমাণে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। কেউ ভয়ে, কেউ সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল, কিন্তু অনেকেই, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা অবজ্ঞাত ও নিগাঁতিত বোদ্ধ ও তথাকথিত অস্পৃশ্য হিন্দুরা ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করেছিল নতুন মর্যাদা লাভের আশায়। যাত্রা পরধর্ম গ্রহণ করল না তাদের মধ্যেও এর প্রতিজ্ঞিতরূপ নতুন এক মর্যাদাবোধ জাগ্রত হল। তারা নতুন করে তাদের প্রচলিত সংস্কার, আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি এবং তাদের আরাধ্য দেবদেবীদের মূল্যায়ন করতে লিখল। তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙ্গালী মধ্যযুগে দৈবনির্ভর হয়ে উঠেছিল বলেই মনসা, ধর্মঠাকুর ও চণ্ডীপূজার ব্যাপ্তি ঘটেছিল এ কথা আংশিক সত্য যাত্র। বিশেষাগত তুর্কীদের আক্রমণ ও হাঙ্গামা প্রতিষ্ঠার ফলে নিম্নকোটির মানুষের জাগরণ বাংলা দেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনাই উচ্চকোটি ও নিম্নকোটির হিন্দুদের পরস্পরের নিকটবর্তী করেছিল এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নূতন সমন্বয় ঘটিয়েছিল।

পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও মিলনের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা কম প্রভাব বিস্তার করে নি। বাংলাদেশে অধিকাংশ ধর্মভরিত মুসলমান নিম্নকোটির হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল বলেই তারা তাদের সুদীর্ঘকালের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, আরাধ্য দেবদেবী এবং নানা অনুষ্ঠান কিছুই ভুলতে পারল না। তাই তাদেরই সমগোত্রীয় হিন্দুরা যখন মনসা পূজা করত, মনসামঙ্গল পাঠত, ধর্মঠাকুরের পূজা করত, গাঙ্গনের গীত গাইত তখন তারা দূরে সরে থাকতে পারত না। মধ্যযুগে এবং আজও বাংলাদেশের এই সাধারণ মানুষই হিন্দু-মুসলমান মিলনের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে ও করছে। মনসামঙ্গলে হিন্দুসমাজের অভ্যুত্তরীয় বিরোধের কাহিনী খুবই স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে। হরদ্বারীভক্ত চাঁদ সওদাগর সহজে মনসাকে মেনে নেয় নি। মনে হয় শৈব হিন্দু বনাম লৌকিক দেবদেবী ভক্ত তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বিরোধ সেন

রাজস্ব কালেই চরমে উঠে ক্রমে ক্রমে আপদের পথে যায়। পঞ্চদশ শতকে বা তার অব্যবহিত পূর্বে এই বিরোধ-মিলনের কাহিনীই মনসামঞ্জল কাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছিল। ইতিমধ্যে তুর্কীরা বাংলার তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে-ছিল এবং বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। “হাসন-হাসেন পালা”র ডাই হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও মিলনের কাহিনীও মনসামঞ্জলে স্থান লাভ করল। দ্বাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রচিত বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও মিলনের যে চিত্র পাওয়া গেছে তা একত্র করতে হলে প্রথমে মনসা-মঞ্জল সাহিত্য নিয়েই আলোচনা শুরু করতে হবে।

মনসা-মঞ্জল কাব্যগুলি কে আগে রচনা করেছেন, কে পরে রচনা করেছেন এ নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে এবং এই বিরোধ পশ্চিমবঙ্গ-পূর্ববঙ্গ বিরোধের আকার লাভ করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনার পথে বিড়ও সৃষ্টি হয়েছে যথেষ্ট। এরই মধ্যে যে পক্ষের বক্তব্য হতটুকু গ্রহণযোগ্য মনে করেছি ততটুকু গ্রহণ করে বিজ্ঞান ও যুক্তি সম্মত পথ অনুসরণের চেষ্টা করেছি।

মনসার গান হয়ত পূর্ববঙ্গে অনেকদিন আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। কারণ ‘সাপের বাথান’ পূর্ববঙ্গে মনসার পূজা বা গান পশ্চিমবঙ্গ থেকে রপ্তানী হয়েছিল এটা সম্ভব বলে মনে হয় না, তবে মনসা-মঞ্জলের পুঁথি লেখা এবং সেই লেখার মধ্যে নানা কাহিনীর সংযোজন—এটা পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম শুরু হয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কাহিনীর দিক থেকে মনসা-মঞ্জল কাব্যগুলিতে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়—পশ্চিমবঙ্গীয়, পূর্ববঙ্গীয় এবং উত্তরবঙ্গীয়—অসমীয়া। পশ্চিমবঙ্গের কবিদের মধ্যে আছেন শিবদাস, কেতকী দাস (প্রথম কেম্যানন্দ), বিষ্ণুপাল, সীতারাম দাস প্রভৃতি। পূর্ববঙ্গের কবিদের মধ্যে আছেন কাণাহরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত, এবং উত্তরবঙ্গ—আসামের কবিদের মধ্যে আছেন নারায়ণ দেব (পুরা নাম রামনারায়ণ দেব হতে পারে) মনকর, ধর্গাবর, বিড়তি, অগণজীবন ঘোষাল ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্র।

মনসামঞ্জলে ‘হাসন-হোসেন পালা’ কেবলমাত্র বিজয়গুপ্ত ও শিবদাস পিণ্ডলাই বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। নারায়ণ দেব প্রভৃতি লিখেছেন প্রব সংক্ষেপে। বিষ্ণুপাল এর হিসাবে অনন্ত। কারণ এর রচনার হিন্দু-মুসলমান ভেদান্তের লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

## ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের গাথে

ভূমি সমস্যা

দেবেন দাশ

বিশাল এই ভারতের গরিবী হাট্টিরে, সমাজজীবনকে সুখী সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তোলার প্রধান উপাদান, ভূমি সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান। কিন্তু স্বাধীনতার তিন দশকের মধ্যে অনেক আইন প্রণয়ন, সরকারী ঘোষণা, সেমিনার, কমিশন ইত্যাদি হেরছে, কিন্তু সমাধানের প্রয়াস শব্দক গতিতে চলেছে। মার্কস বর্ণিত “কামনার এক জগতের সঙ্গে ভূর্গণ্যতার এক জগতের অপূর্ব মিলন” আজও চলেছে।

হিংস্র শাসনব্যবস্থার ঐতিহ্য অনুগামীতার প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমাদের তিলোত্তম সংবিধানের বিধানগুলিকে ভূমি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অক্ষম পণ্য করে তুলেছে। ১৯৭১ সালের আদম শুমারীর হিসেবে ভারতের মোট জনসংখ্যা ৫৪ কোটি ৬৯ লক্ষ : এর মধ্যে গ্রামীণ মানুষের সংখ্যা ৪০ কোটি ৮০ লক্ষ আছে। সমগ্র জনসংখ্যার ১৮ কোটি ৪ লক্ষ নরনারী কর্মরত। এঁদের মধ্যে গ্রামীণ কর্মরত নরনারীর সংখ্যা ১৪ কোটি ৮৪ লক্ষ। এই কর্মরত জনসংখ্যার ৩৪ শতাংশ স্ব-কৃষি ও ক্ষেতমজুর ২৬.৫ শতাংশ এবং কুটির শিল্পী ০.৬ শতাংশের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে কোনরকমে সমাজজীবনে বেঁচে আছেন, টিকে আছেন।

ব্রিৎস পত্রিকার তথ্যমতে আবাদী জমির পরিমাণ ১৬০.৫ মিলিয়ন বা ১৬ কোটি ৫ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে প্রতি বছর গড়পড়তা আবাদ হয় ১৩ কোটি ৯৭ লক্ষ হেক্টর আর ২ কোটি ৩০ লক্ষ হেক্টর জমিতে একাধিক চাষ হয়। আবাদযোগ্য পতিত জমি রয়েছে ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ হেক্টর। জমির এই রূপ-রেখা বিচার করে ব্রিৎস দেখিয়েছেন শতকরা ১ শতাংশের কব্জার—১৬ শতাংশ ও ৫ শতাংশের দখলে ৪০ শতাংশ আবাদী জমি রয়েছে। সমগ্র তথ্যে ১০ শতাংশের হাতে আবাদ জমির ৫৬ শতাংশ এবং নীচের দিকে ৫০ শতাংশ কৃষিজীবীর দখলে মাত্র ৪ শতাংশ আবাদী জমি রয়েছে। ( ১৫. ৮. ৭৫ )

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুদিন আগে পরিবর্তন কমিশনের টাস্ক ফোর্স<sup>১</sup> যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা লক্ষণীয়। (১) রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব (২) নীচের থেকে চাপ সৃষ্টির অভাব (৩) আমলাতন্ত্রের জনবিমুখীন মনোভাব (৪) আইনগত অটলতা—(৫) নিরুত্তভাবে ভূমিসংক্রান্ত 'কাগজপত্র' (record) না থাকা। তাদের এই অভিমত সমূহ তথ্যগত বিচারে সর্বজন-স্বীকৃত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আজ যখন ২০ বর্ষ বর্ষদুর্গী রূপায়ণের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতির প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে তখন উপরোক্ত বিষয়গুলির বিবেচনা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা বিষয় বিবেচ্য হয়ে উঠেছে। মিশ্র অর্থনীতির নামে জাতীয় অর্থনীতিকে যে বিপর্যয়কর অবস্থায় এনেছে, সে সম্পর্কে গত ৭৪ সালের ডিসেম্বরে এদেশের অর্থনীতিবিদগণের সুপারিশগুলিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। তারা বলেছেন ংউৎপাদনীক্ষেত্রে দীর্ঘকালব্যাপী মৌলিক ভাব-সাম্যের চূড়ান্ত অভাব ংউপার্জন ক্ষমতার অবিচারপূর্ণ বৈষম্য এবং উৎপাদন-ইলতা-বিবোধী সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোই দেশব্যাপী সংকটাবর্ত সৃষ্টি করেছে। তাই অনেকগুলি সুপারিশের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রের সম্পর্কে তারা যে অভিমত দিয়েছেন তাতে বলেছেন, “পরিবারের লোকজন দ্বারা বীরা চাষ করেন তাদের মধ্যে জমি বন্টন করা উচিত।”

এখন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আসার আগে ১৯৬৭ সালের ৬ই ও ৭ই জুলাই সারা ভারতের মুখ্যমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয় তার সিদ্ধান্তগুলি কি ছিল তা দেখা প্রয়োজন। এতে বলা হয় যে ১) (ক) সর্বপ্রকার উচ্ছেদ বন্ধ করা প্রয়োজন। (খ) যে রাজ্যের আইনের বিধানে মালিককে উচ্ছেদের অধিকার দেওয়া আছে তা স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) রেজা-মূলক ইন্ডুফাশন সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে হবে। (কারণ এটা হল বা কৌশল প্রয়োগে উচ্ছেদের পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য।) ২) রাজ্যের হার হ্রাস করার ব্যবস্থা। (৩) প্রজাপত্রের বাস্তব অবস্থা বোঝবার জন্য ভূমিসংক্রান্ত রেকর্ডসমূহ সঠিক করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্যই করণীয়। ৪) ংশ ও অস্বাস্ত আবেগকরী সাহায্য ও সুযোগ খাতে চাষীরা পেতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। ৫) প্রজাপত্র আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনসহ প্রচোগ ব্যবস্থার—জমির উচ্চতম সীমা নির্ধারণ ংগঠনগত ভিত্তিতে উত্তম জমি বন্টন ংউচ্ছেদ বন্ধ করার ব্যবস্থাকে কার্যকরী

করতে হবে। এই সঙ্গে পারিবারিক জমির সীমা নির্ধারণ ও ব্যক্তিগত চাষ করার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থাও প্রয়োজন। ৬) ভূমি সংস্কার আইনের বিধি বিধান ও নিয়মাবলী সমূহ অত্যন্ত সহজ ও সরল হওয়া প্রয়োজন। আইনের মারপ্যাচও বন্ধ করতে হবে।

এর পরে ৮ বছর ৮ মাস পরে গত ৫ই মার্চ থেকে ৭ই মার্চ দিনটিকে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে ভূমিসংস্কারের প্রস্তুতি পুনরায় আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনার প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে ভিত্তি করে মুখ্যমন্ত্রীরা স্ব স্ব রাজ্যে ভূমিসংস্কার কর্মসূচীকে নীতিগত ও আইনগতভাবে রূপায়িত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি হয়েছেন।

গত মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনের সঙ্গে এবারের সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলির পার্থক্য খুব বেশী না থাকলেও ২০ দফা কর্মসূচীর পটভূমিকায় এর গুরুত্ব অনেকখানি। এ সম্পর্কে পর্যালোচনার পূর্বে ভূমি ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা একটু লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

সারা ভারতে কৃষিজমি ও কৃষি নির্ভরশীল পরিবার ৭ কোটি ৫ লক্ষ। এর মধ্যে ক্ষেতমজুর পরিবার প্রায় ৪ কোটি এবং এদের মুখ্য অংশই প্রায় ভূমিহীন ও ব্যক্তিগতহীন। মূলতঃ এই অংশের সমস্যা সমাধান না করে গ্রামীণ সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন আদৌ সম্ভব নয়। তাই ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা রূপায়ণের কর্মসূচীতে উৎকৃষ্ট জমি গ্রহণ ও বন্টন কিস্তাবে হচ্ছে তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

১৯৫১ সালে অধ্যাপক প্রশান্ত মহালনবীশ পরিচালিত সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয় যে ভারতে ৬ কোটি একর আবাদী ও আবাদযোগ্য উৎকৃষ্ট জমি রয়েছে যা ভূমিহীনদের বন্টন করা যায়। অর্থাৎ প্রতিটি ভূমিহীন পরিবারের হাতে ১'৫০ একর পরিমিত জমি দেওয়া সম্ভবপর এই তথ্যে স্বীকৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে ভারত সরকার নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটি ১৯৭০ সালে বলেন মোট ৪ কোটি একর বন্টনযোগ্য জমি রয়েছে। এই তথ্যানুসারে ১ একর - হিসাবে প্রতিটি ভূমিহীন পরিবার পেতে পারত। কিন্তু বর্তমানে “জাতীয় নির্দেশক নীতি” রূপায়কগণের হাতে স্থিরীকৃত হয়েছে যে মাত্র ৪০ লক্ষ একর আবাদী জমি হস্তান্তর ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করারজন্য পাওয়া যাবে।

সম্প্রতিকালে সরকারী হিসেবে কত রিটাণ দাবি ও কতগুলির বিচার হয়েছে এবং তাতে কত জমি উৎকৃষ্ট ঘোষিত তার একটি তথ্য পাওয়া

গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এইসব উৎকৃষ্ট জমির কত পরিমাণ সরকার অধিগ্রহণ করেছেন ও কত পরিমাণ বিলি বন্টন হয়েছে, তাও এই তথ্যের মধ্যে জানা গিয়েছে। আর এই তথ্যাক্রমটি দেখলে বলতে হয় সত্যিই বিচিত্র এদেশ।

লোকসভায় কেন্দ্রীয় মেম্বরশ্রী শ্রী ১২.১.৭৬ তারিখে এক বিবৃতিতে বলেছেন যে “শ্রী ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা ভারতে ৫,৮৮,০০৪ একর জমি উৎকৃষ্ট বলে ঘোষিত হয়েছে। তার মধ্যে ২,৯১,৬৫৪ একর অর্থাৎ ৪৯.৬০ শতাংশ সরকার অধিগ্রহণ করেছেন। এবং ১,৫২,৭২৮ একর তথা উৎকৃষ্ট জমির ২৫.১ শতাংশ ৫৪,১১২টি কৃষিহীন পরিবারের নিকট বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। বন্দোবস্ত গ্রহীতাদের মধ্যে ১৪,৭৫০টি পরিবার তদন্বয়ী ৫,০৬১টি পরিবার উপজাতি সমাজের ও অগ্রান্ত কৃষিহীন ৩৪,৪০৮টি পরিবার আছে।

এই পটভূমিকায় নিম্নোক্ত তথ্যগুলি বিচার্য হয়ে উঠেছে।

| রাজ্যের নাম     | ব্রিটিশ পাণ্ডিল | ব্রিটিশ বিচার | ( একর হিঃ )               |                        | বিলিকৃত জমির পরিমাণ |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                 |                 |               | উৎকৃষ্ট ঘোষিত জমির পরিমাণ | সরকার কর্তৃক অধিগ্রহীত |                     |
| অন্ধ্র          | ৫,২৮,১৪১        | ৫৬,৪৬০        | ২৪,০০০                    | ৫০০                    | —                   |
| আসাম            | —               | —             | —                         | —                      | —                   |
| বিহার           | ৩২,৭৭৪          | ৩২২           | ২১,৫৮৭                    | ৪,৮৪৮                  | ৪,৮৪৮               |
| হরিয়ানা        | ৫৪,১২০          | ৬০০           | —                         | —                      | —                   |
| হিমাচল          | ২,৬৮৭           | ২,৫৮৯         | ৬২,৯৫৩                    | ৪০,০০০                 | ১,৭১৪               |
| কর্ণাটক         | ১৮,০০০          | ৪,৪৫৩         | ১০,৫২০                    | —                      | —                   |
| কেরালা          | ৩৭,৫০১          | ৩১,৩০১        | ৩১,২৮৬                    | ১১,৭২০                 | ৬,২৬৪               |
| মধ্যপ্রদেশ      | ১,২৭,৫৮৫        | ৭১,৭০৪        | ৩,৫১৭                     | ১৫                     | —                   |
| ওড়িশা          | ৩০,০০৫          | ১,০৬২         | ৬,৮১৪                     | ৩,৭০০                  | —                   |
| পাঞ্জাব         | ৩৭,৭৭২          | ১৪,৭২৪        | ৬২৬                       | ৪২২                    | ১৬৮                 |
| রাষ্ট্রহাসন     | ৪২,৭৮০          | ১৯,২১১        | ১,৪২,৯৭২                  | ৬৬,৩৭৫                 | ৫২৯৫                |
| তামিলনাড়ু      | ২৮,০৪২          | ২০,২৮৪        | ৪১,৫৮১                    | ৩৮,৭০২                 | ২৬,৭০৪              |
| উত্তরপ্রদেশ     | ৩২,৭১১          | ৩৪,৪১৬        | ১,২৬,৫৭০                  | ৪৭,৩৪৯                 | ৮,৫১১               |
| পশ্চিমবঙ্গ      | ১০৬             | ১০৬           | ৪,২৪০                     | —                      | —                   |
| পশ্চিমবঙ্গ      | ৪০৫২৮           | ১৫২৫০         | ৫৮৮৪৪                     | ৩৩১৪৬                  | ২০৮১৫               |
| গুজরাট          | —               | —             | ৪২,১২২                    | —                      | —                   |
| জম্মু ও কাশ্মীর | —               | —             | —                         | —                      | —                   |

সমাজতাত্ত্বিক সমাজ গড়ার কামনা আর পদবিমুখীন আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কর্তৃত্বাতনা এই তথ্যের মধ্যে স্পষ্টিস্থুট। এখন গ্রামীন সমাজের বাস্তব অবস্থাটা কি অবস্থার পৌঁচেছে তা একটু দেখা প্রয়োজন। ইকনমিক টাইমস অব ইণ্ডিয়ার গত ১.৫.৭১ তারিখে যে তথ্য বেরিয়েছিল তা দেখলে গ্রামীন জনজীবনের যে আলেখ্য দেখা যায়—তাতে দেশপ্রেমিক ও জন-জীবন পুনর্গঠন কামীর উদ্বিগ্ন বোধ না করে পারেন না। তথ্যে বলা হয়েছে ভারতের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ পল্লীবাসী। ১৯৬০-৬১ সালে এদের ৫৮ শতাংশ খাওয়া-পরাহ সংহানহীন ছিল না। ১৯৬৮-৬৯ সালে তা বেড়ে ৫৯ শতাংশ হয়েছে। এরপর ৬ বছর গত হল। মৃত্যুশ্রীতি, প্রবামূল্য-বৃদ্ধি ও বেকারীর চাপ এই কালে ক্রমাগত বেড়েছে। ফলে অবস্থা কোথায় গিয়েছে, তা অনুমান করলে শঙ্কিত হতেই হয়।

উপরোক্ত অবস্থাগুলি স্বরূপে বেখে মুখামস্ত্রী সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রীর উদ্বোধনী ও সমাপ্তি বক্তব্য এবং মুখামস্ত্রীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তগুলি কিভাবে কার্যকরী করা যাবে তার চিন্তা আজ দেশপ্রেমিক জনজীবন পুনরুজ্জীবনকামী নর-নারীকে করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বর্ধাহীন ভাষায় বলেছেন "উৎকৃষ্ট জমি দখল, বরাদ্দ ও বন্টন ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়সূচীর মধ্যে কাজ করতে হবে। ভূমি সংস্কার সম্পর্কে রাজ্যগুলি চেষ্টা করছে। কিন্তু সেটাই সব নয়। তাঁরা আরো দ্রুতগতিতে এ কাজটা করুন।... এমন কিছু কায়দা স্বার্থের লোক আছেন, যারা এই সংস্কার চান না। অথবা ভূমি সংস্কারের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষ অজ্ঞান। এর যে কোন কারণে, ভূমি সংস্কার সম্পর্কে গড়িমসি ও বিধা ঘন্ব রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে বিলম্বের কারণ নির্ণয় করে, মুখ্য-মন্ত্রীদের দ্রুত প্রতিবেদক ব্যবস্থা নিতে হবে। আইনকে সরলীকরণ করতে হবে।

বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকা ছিল। এই সব এলাকার অবস্থা আগের মতই সন্তোষজনক নয়। এ সমস্যার সমাধান ভাড়াভাড়ি বুঁজে বের করতে হবে। কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী একসঙ্গে বলে, ভূমিসংক্রান্ত রেকর্ড ও ভূমিরত্নের রেকর্ডের সমস্যা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন।

আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর লক্ষ্য হল, অত্যন্ত দুর্বল জেলীর লোকদের দুর্বলতার লাঘব করা। জাতি গঠনের সঠিক পথে লোককে নিয়ে যাওয়া।... সাধারণভাবে পর্যালোচনার বদলে, ভূমি সংস্কার ও গ্রাম পুনর্গঠনের কর্মসূচীর বিষয় নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন।

ভূমি সংস্কারের প্রথমটি নতুন কিছু নয়। এটা ২০ বর্ষ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত; অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য এর গুরুত্ব অনেক। ...লক্ষ্য পৌছাবার নামে কোথাও কোথাও বনভূমি ও সাধারণ অনুরণ বা কল্যাণ বধন করা হয়েছে; আমি একে ভূমি সংস্কার মনে করি না। ...স্থানীয় রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে বড় বড় মালিক চাষীদের যোগ-সাজসে সমস্তকে জটিল করে তুলেছে।

বেসরকারী অংশগ্রহণও সব সময়ে সংস্কারের ক্ষেত্রে সহায়ক হয় নি। ... সংস্কার কি ধরনের লোক নিয়োগ করা হয়েছে, তার ওপর অনেকটা নির্ভর করে।" [ অর্থাৎ কারেমী বার্ষিক বাস্তবিক সংস্কারমণ্ডা থেকে বাধা সৃষ্টি করে তা প্রধানমন্ত্রীর অনুজ্ঞার মণ্ডা এসেছে। ]

বিভিন্ন দিনে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন—“জাতীয় পুনর্গঠন কর্মসূচীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল ভূমিসংস্কারকে কার্যকরী করা। ভূমি-সংস্কারের নিকট নৃষ্টি না দিলে উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে বাহিত কল লাওয়া যাবে না, সুতরাং ভূমিসংস্কার ও গ্রামীন দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতি সাধনের ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। ...সমস্তটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী। কিছু কিছু রাজ্যে প্রচুর জমি চাষের অনুপস্থিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একটি রাজ্যে এর পরিমাণ ১৩ লাখ। সুতরাং ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা সরকার।

জমির বেনামী ও বে-আইনী হস্তান্তর বন্ধ করার জন্য ভারত সরকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। বর্ণাশ্রমের অধিকারকে লিপিবদ্ধ করার জন্য দেখানে প্রয়োজন যেখানেই বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে।

আলোচনার শেষে আইন মন্ত্রী শ্রী গোখলে বলেছেন, “ভূমিসংস্কারের বাপারে আদালতের এস্তিমার খরচ ইওয়া উচিত। জমির বেনামীকরণ ও বে-আইনি লেনদেন বন্ধ করাও প্রয়োজন।”

আলোচনার শেষে সিদ্ধান্ত হয়েছে, জমির সর্বোচ্চ দীমা ৩০ শে জুনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে। যে সব ক্ষেত্রে মারাত্মক আইনগত বাধা (?) আছে সে-সব ক্ষেত্রে ছাড়া জমির সর্বোচ্চ দীমা সংক্রান্ত আইনগুলি ৩০শে জুনের মধ্যেই কার্যকরী করা হবে।

দেখে একটা চলতি প্রবচন আছে—ইঙ্গিতে পণ্ডিত বুকে মুখে বুকে কিলে।

স্বাধীনতার পর প্রায় তিনটে দশক জুড়ে কারেমী স্বার্থকে দলীয় সংগঠনে ও জাতীয় প্রশাসনে শক্তিশালী হওয়ার পথে সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অস্বাভাবিক লব্ধী একচেটিয়া পুঁজির শক্তিশালী বিকাশ ও সামগ্রিকত্বের অবশেষকে বাঁচিয়ে রেখে মিশ্র অর্থনীতির নামে—যা করা হয়েছে—তার প্রত্যক্ষ ফল—ফ্যান্ডিসবাদী প্রতিক্রিয়া বাস্তব রূপ পেয়েছে। এখন তাকে প্রতিরোধ করার জন্য যে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছে এবং যে ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আকৃতি আজ লক্ষ্যণীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এখন প্রশ্ন বোঝাটা সঠিক করা হয়েছে এবং ঠিকঠিক নির্ণীত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু প্রশ্নোত্তরটা কিভাবে হবে এবং কে করবে? শাসক দলের কর্মীদের কি প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীগণ ভূমিসংস্কারের কর্মসূচীতে ক্ষেত্রে মজুর ও গরীব কৃষকদের সঙ্গে নামাতে পারবেন? কিংবা শাসক পাটির মধ্যে সামন্ত শোষক শ্রেণীর যে অবশেষ গোষ্ঠী এবং বড় বড় জোতের মালিকবর্গ রয়েছে তাদের কি দল থেকে বহিস্কার করে, প্রগতিশীল শক্তিকে সংহত করতে পারবেন? এটা যত দিন না করা যাবে ততদিন কি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ও মুখ্যমন্ত্রীদের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা যাবে না? এবং ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে যে অটিলতা ও ব্যর্থতা দেখা যাচ্ছে তার বাস্তব সমাধান হবে না—একথাটা আমাদের বুঝতেই হবে।

প্রথমত উত্তম জমি কোন মৌজায় কত আছে, কত বেনামী ও বৈ-আইনী হস্তান্তরিত করা হয়েছে, তার তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কারেমী স্বার্থ ও আমলাতন্ত্রের যোগসাজসে ও পাটোয়ারী বুদ্ধির কুসরতে এ তথ্য “বিজ্ঞা-বুদ্ধিজীবী” গণতান্ত্রিক মতাদর্শ অনুগামী কর্মচারী বা রাজনৈতিক কর্মীদের সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। এর একমাত্র প্রতিবেশক ব্যবস্থা মৌজা অফিস, রক, মহকুমা ও জেলা স্তরে গণ উদ্যোগ সৃষ্টির জন্য মজুর-কৃষক প্রতিনিধি সহ গণতান্ত্রিক কমিটি গঠনের দাবী হতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর কথাই বলা যায় যে, সংস্থায় দলীয় লোক যারা যাবেন তাঁরা বাস্তবে কি ধরনের লোক তা যাচাই করতে হবে। ঘুঘোর দূর্নীতিগ্রস্ত টাউট ধরনের লোকেরা এই ধরনের সংগঠনে বেশ কিছু ভীড় করে। এরা যাতে গণতান্ত্রিক কমিটিতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে তাঁর জন্য মনোনিবেশ ব্যক্তিদের সম্পর্কে জনমত বিশেষ করে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের অভিমত গ্রহণ প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিহীন চাষীর সংখ্যাগত তথ্যও গ্রামওয়ারী সংগ্রহ করা জরুরী।

এই সব তৎপরতার সঙ্গে গ্রামওয়ারী বেকর্ড সঠিকভাবে তৈরী করা

এবং উন্নত জমির অধিগ্রহণ সম্পন্ন করে দ্রুতিসংগত বন্টনব্যবস্থাকে সংগঠিত করতে হবে। এর জন্য গণতান্ত্রিক কমিটির সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সহ যথাবোধ্য ক্ষমতাও দিতে হবে।

বাজো বাজো শ্রমিকগণালি যে আমলাতন্ত্র নির্ভরতায় ভূমি সংস্কারের কর্মসূচী অনুসরণ করতে চাইছেন তার বাস্তব অবস্থা, জমির হিটার্ণ দাখিল, হিটার্ণগুলির বিচার, উন্নত জমির পরিমাণ ঘোষণা, অধিগ্রহণ ও বন্টনব্যবস্থা বাস্তবভাবে অতীতের দায় গুরু গুরু নীতি অনুসারেই চলছে। সংঘাতোত্তর তথ্যগত রূপ আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। তাই প্রধানমন্ত্রীর মৌলিক সমীক্ষা ও উদ্যোগ ঘোষণা বার্ষিক হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে জনগণ হতাশী সন্দেহ পোষণ করবেন—একথা কি অস্বীকার করা যায়? কারণ এ রাজ্যে ১৯৭২ সালে যে ১৭ লক্ষ কর্মসূচী নিয়ে নির্বাচন হয়েছিল তার কিভাবে দফারফা হল তা আমরা দেখেছি।

এখন একটা কথা গণতান্ত্রিক শক্তিকলিকেও বুঝতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনের টাস্ক ফোর্স যে কথাগুলো বলেছেন তার মধ্যে রয়েছে, নীচের দিক থেকে চাপ সৃষ্টির অভাব, ভূমি সংস্কারের কর্মসূচী রূপারনের ব্যর্থতাকে বাস্তব করেছে—; একথাও অনস্বীকার্য। কৃষক ও ক্ষেত মজুর সংগঠনগুলি—সাঁরা ভারতের ৫ লক্ষাধিক গ্রামের কতকগুলি গ্রামকে তাঁদের সংগঠনের আওতার বা প্রভাবের মধ্যে এনেছেন। গণতান্ত্রিক শক্তিকলির দুর্বলতাই প্রতিক্রিয়াদলীদের শক্তির ব্যাপকতাকে রক্ষা করেছে একথাটাও আমাদের বুঝতে হবে।

কৃষক ও ক্ষেতমজুর এমনকি শিল্প, শ্রমিকদের যেটুকু সাংগঠনিক রূপ আছে, তাও আমরা বিভেদ ও বিরোধের ফলে বহুগা বিচলিত। জন সমর্থনহীন, সংগঠনহীন, মধ্যশ্রেণীরা বাকবিল্লব বিলাসীদের বিলবসাধন। তাই অসহায়ভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতৃত্ব যদি সত্য সত্যি কৃষিবিপ্লব চাইতেন তাহলে কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সংগঠনগত ঐক্য বজায় রেখে, নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ভারত জোড়া পরিসরে ভূমি সংস্কারের সংগ্রামকে তীব্র ও মাননিত করার মধ্যে একটা শক্তি রূপে প্রতীয়মান হতেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁরা অসহায়ভাবে নিজেদের গণ আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

তাই আজ কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লববাদী সুব-ভায়া গোষ্ঠী সহ প্রগতিশীল

অংশের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ় মোর্চা গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। দ্বিধা আছে বন্ধ আছে, যতদূরগত পার্থক্য আছে, তা সত্ত্বেও ২০ দফা কর্মসূচীকে ভিত্তি করে ঐক্যের শক্তিকে বৃদ্ধিমান করতে হবে। মতুবা সংকীর্ণতাবাদের অন্ধগুলিতে দিনেহারা হয়ে আজীবন দিশারীষ্ট খুঁজে যাব।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনের দায়িত্ব যে আমলাতন্ত্রের উপর রয়েছে— তারাই গঠন শাসনের Law & Order—অর্থাৎ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কর্ম-সূচীতে দীক্ষিত ও শিক্ষিত। ফলে এরা জনবিমুখীন সেই ঐতিহ্য অনুগামীতার আজও চলছে। স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থানুগ শান্তি ও সহযোগিতার বিপরীত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রভুত্ববাদী ও সবজাতা মনোভাবাপন্ন আমলাতন্ত্র সর্ব-বিভাগের সর্বস্তরে নিয়ন্ত্রণ করে রয়েছে। এরা নিজেদের জনগণের প্রভুরূপে আজও মনে করে। এবং সেই হিসাবে চলতেও চেষ্টা করে। কাজেই জনজীবন পুনর্গঠনের জগৎ যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞা এবং কংকোলমগত জ্ঞান প্রয়োজন এদের তা নেই। এমনকি উচ্চ আধুনিক অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের মনস্তত্ত্ব ও মানসিক সংগঠন সম্পর্কে এদের কোন ধ্যানধারণা নেই। সমস্যাগুলির প্রত্যেক করে মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত রেখে শাসনব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া ও বিলাসবহুল জীবন-যাপনই এদের জীবনের সুখা কথা।

সমগ্র স্বাধীন দেশগুলির সামনে আজ অগ্রহীন সমস্যা। তার সমাধানের জগৎ কৃষি ও শিল্পের বিকাশ সাধন, পুনর্গঠন ও ব্যাপক উৎপাদন সংগ্রহ ও কায়দসজ্জ বন্ধন ব্যবস্থা জরুরী। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদ টটিহাদের গতিপথে তার শাসন-দণ্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হলো শোষণব্যবস্থাকে বজায় রাখার জগৎ বহুদুর্ভীর্ণ কর্ম-কৌশল ও তৎপরতা নিয়ে চলছে। তারতে তার গতি-প্রকৃতি আজ আর কারো অলক্ষ্যে নেই। সে এদেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রের উচ্চকোণীর আমলা-তন্ত্র একচেটিয়া পুঞ্জিগতি সামন্ত শোষণের অবশেষ সহ সাম্প্রদায়িকতাবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে অশান্তাতবদ্ধ হয়ে জাতীয় অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধতির প্রয়াসকে বাধা করতে গাইছে। তারই প্রত্যক্ষরূপ এদেশে আমরা ১৯৭৪-৭৫ সালে দেখেছি।

সমাজতান্ত্রিক দেশ বিশেষ করে সোভিয়েত সাহায্য ও সহযোগিতার যে শিল্পায়নের প্রচলন ক্রম-বিকাশিত ও সংগঠিত হচ্ছে—এবং কৃষিক্ষেত্রে ও তার রূপরেখা দৃষ্টময় হয়েছে তাতে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠী ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া

খুবই অশুশী। তারা ভারতের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক বিপন্ন করার বহুমুখীন প্রক্রিয়া নিয়ে চলেছে।

এই অবস্থার বেশের জনগণের সংহতি ও অর্থনৈতিক সমুন্নতি অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু শাসক পাটির একটা বড় অংশ মন্ত্রিসভার মধ্য থেকেই প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে সমর্থন জানিয়ে ভিতর থেকে বানচাল করছে। এটাও অলঙ্কার নেই। তাই আমরাই যেনকে কৃষি সংস্কার ও কৃষি উন্নয়ন—শুধু মন্ত্রীদের কাষণে—কথা সরিং সাগর রচিত হইবে—এবং দরিদ্র মানুষের দারিদ্র ক্রমাগত অগ্রহীন হয়ে উঠেছে।

একথা আমরা জানি গণচাপসৃষ্টির শক্তিশালী ও দূর্বল। সারা ভারতের কৃষি-মজুর ও কৃষিজীবী জনগণের মাত্র ৫ শতাংশ সংগঠিত, হয়তো আরো ৫ শতাংশ এই সাংগঠনিক শক্তির প্রভাবে প্রভাবিত। মহাশত্রুর বিপ্লবী চেতনা-সম্পন্ন অংশসহ স্বাক্ষরীত তত্ত্ব অনুগামী শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধভাবে গ্রামীন সমাজের জনগণের মধ্যে থেকে তাদের জীবনের সরিকানা নিয়ে যদি কাজ করেন তাহলে অবস্থার পরিবর্তন কিছুটা সম্ভব। বিপ্লব বিপ্লব খেলা যারা করছেন তাদের বুঝতে হবে—আগুন নিয়ে যেমন খেলা করা যায় না—বিপ্লবও তেমনি। বিপ্লবের শক্তি উৎপাদনকারী শ্রেণী। সম্পদস্রোত নয়নারী। মজুর ও কৃষক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাভিবিদ ও কংকোলজী—জ্ঞানের অধিকারী গণ এই বিপ্লবী শক্তির খনিষ্ঠ মিত্র। কারণ এ দুগুটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এবং কংকোলজগত জ্ঞানের সীমাহীন বিকাশের দুগ। উৎপাদন ক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করার দুগ।

তাই ২০ দফা কর্মসূচী অতীতের ঘোষণাবলীর সূত্রায়িত ও সংহতিগত কর্মসূচী। এই কর্মসূচী যুগোয়া ভাবাদর্শনুগ সমাজজীবনের বিরোধী নয়। ভাসবেও করেকশত জাতি উপজাতি এবং সহস্রাধিক জাতি বর্ণ সমাজ্রিত ভারতের অগ্রহীন সমস্ত সমাজানের এটা মুক্তিযুদ্ধ গতিগত। এই পথের ধারায় সর্বোচ্চ চাই কৃষি সংস্কারের ব্যাপক আন্দোলন—চাই কৃষি উন্নয়নের মুক্তিযুদ্ধ কর্মসূচী। এরই সহযোগী হিসেবে ভারী, মাকারী ও ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপক সাংগঠনিক ব্যবস্থা। আর এ ব্যবস্থা মুখ্যতঃ রাষ্ট্রায়ত্ত্বাধীন হওয়া প্রয়োজন।

মূলকথা সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের জরুরী প্রয়োজন—তা পরিচালনা কামিনের টাঙ্ক ফোর্সের বস্তাবে সুপরিফুট হয়েছে। বাস্তবে শাসক পাটির নেত্রী হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে দণ্ডি প্রত্যাহই প্রকাশ

করছেন তা তাঁর দলীয় মন্ত্রীরা, আইনসভার সদস্যরা ও পার্টি সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের মধ্যে আছে কি? এসম্পর্কে জনগণের সন্দেহ রয়েছে এবং তা অকারণ নয়। কারণ বর্তমান সমাজব্যবস্থার সম্পদ, সুখ, ক্ষমতা ও প্রভাব কমে যাবার ভয় এদের একটা বড় অংশের আছে। এবং সেটাই ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের পথে বড় বাধা হয়ে উঠছে। এ বাধা অতিক্রম করতে হলে চাই বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি—বিশেষভাবে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট সংহতি। কিন্তু ইতিমধ্যে “বাম নয় ডানও নয়” এই আওতাধীন গিরে শাসক পার্টির একাংশ বাম অভিমুখীনতা থেকে দক্ষিণ মার্গে সংগঠনকে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়েছে। তাই এই শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহযোগী হিসেবে উদ্ভূত হচ্ছে এটাও আজ আমাদের দুঃখে হবে।

এই পর্যায়ে মতাদর্শগত পার্থক্য এমনকি বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কর্মসূচী-ভিত্তিক সংহতি গড়ার সর্বতোপ্রয়াস জরুরী হয়ে উঠেছে।

চাই (১) পরিবার নিদিষ্টকরণ (২) আবাদকৃত জমির পারিবারিক উচ্চ-সীমা ভারতজোড়া পরিসরে একই নীতিভিত্তিক করা প্রয়োজন। (৩) সমস্ত বেনামী ও বে-আইনি হস্তান্তরিত জমি দখল। (৪) ভূমিহীনদের তালিকাকরণ ও স্বাধায় বটন (৫) সমস্ত প্রান্তিক ও ২ হেক্টর পর্যন্ত চাষীর উৎপাদনী সম্ভার গঠন। (৬) ফসলের দ্বািতা মূল্য তথা লাভজনক মূল্য নির্ধারণ করে উৎকৃষ্ট ফসল—আর্থিক ফসল (Money crops) বিক্রয়ের সরকারী ব্যবস্থা। (৭) এই অংশের অধিষ্টি করে ফসল বক্রক রেখে উৎপাদনী অংশ ও অভাবকালে দ্বিতীয় অংশ দেওয়ার ব্যবস্থা। (৮) কৃষিজাত পণ্য মূল্যের সঙ্গে শিল্পজাত পণ্যের সমতা রক্ষা করা এবং (৯) ক্রেতা সমবায়ের মাধ্যমে বটন ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করা। (১০) গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণ ব্যবস্থা সহ ব্যাপক অগভীর ও গভীর নলকূপ, বড় বড় ইন্দ্রাণী এবং নদীপ্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক সেচ সংগঠন ও জলনিকালী ব্যবস্থা করে জমিকে দো-ফসলী, তে-ফসলী করা একান্ত জরুরী। এই সঙ্গে গ্রামীন কুটির শিল্পের সমুন্নতি ও ব্যাপ্তি ঘটতে হবে।

এ কাজগুলি—২০ দফা কর্মসূচীকে স্বার্থকভাবে রূপায়িত করতে পারে। আর এই রূপায়ণ জাতীয় অগ্রগতির পথ খুলে দিতে সক্ষম হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বস্তরে ঢেলে সাজাতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানমুখীন করা এবং নিরক্ষরতার অবসান ঘটানর জ্ঞান ও ব্যাধ ব্যবস্থা নিতে হবে।

## প্যালেস্টাইন সমস্যা ও তার সমাধান

কান্দীনাথ চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান বিশ্বে যে-কটি সমস্যা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার মধ্যে প্যালেস্টাইন সমস্যাটি অন্যতম। প্যালেস্টাইন হল আরব দুনিয়ার একটি অংশ। প্যালেস্টাইনের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার প্রাকৃতিক সম্পদ বিচার করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আরব দুনিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকে সাম্রাজ্যবাদ কেন তার ভাবেবার বাটের কৃষ্ণগত করে রাখার অজ্ঞ মরিয়া হয়ে উঠেছে। আরব দুনিয়ার এই ছোট্ট অংশটুকুর পশ্চিমে জম্বাঙ্গাসাগর, উত্তরে লেবানন, পূর্বে সিরিয়া ও জর্ডান নদী, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগর ও সিনাট অঞ্চল। অর্থাৎ ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার সঙ্গে আরব দুনিয়া এই ছোট্ট অংশটুকুর মাধ্যমে যুক্ত। প্যালেস্টাইনের আয়তন হল ২৭,০২৭ বর্গ কিলোমিটার। অতীতে অনেকে এই অংশটুকুকে “সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল” বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে হাীদের আমরা ফেলিস্তিনীয় বলি, তারা হলেন এমোবাটস, ক্যামানাইটস, আরামিহেনস ও আরবদের বংশধর। সুতরাং বর্তমান প্যালেস্টাইন সমস্যা প্রথমে ফেলিস্তিনীয়দের কোনো অস্তিত্ব ছিল না বলে সাম্রাজ্যবাদী ও তার ভাবেবার মহল থেকে যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে তা যে সর্বৈব মিথ্যা তার প্রমাণ হল ফেলিস্তিনীয়দের ইতিহাস।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ সনে আরব উপদ্বীপ থেকে সেমাইটরা পলে পলে দেশভ্রমণ করে ইজিপ্ট, ইরান, সিরিয়া ও লেবানন অভিমুখে যায় এবং খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০তে এই ঘরনের একটি গোষ্ঠি প্যালেস্টাইনে বসতি শুরু করে। এরা ক্যামানাইটস বলে চিহ্নিতহাসে পরিচিত। খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ সনে প্যালেস্টাইনে কামিনদের রাজত্ব গড়ে ওঠে এবং এটাকেই প্রথম রাজত্ব বলা হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সন নাগাদ ধর্ম-প্রবর্তক মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদরা ইজিপ্ট থেকে পালিয়ে সিনাই উপদ্বীপ অঞ্চল অতিক্রম করে ডেড সির পূর্বাঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। পরে জোসুহাের নেতৃত্বে ইহুদরা কামিন রাজত্বের ওপর

কিছু অংশমাত্র দখল করতে সক্ষম হয় এবং এই অংশটুকু হল অর্ডান নদীর পূর্ব দিক। রাজা সাউলের নেতৃত্বে খ্রিস্টপূর্ব ১০২০ সনে এদের রাজত্ব গড়ে ওঠে। তাঁর উত্তরাধিকারী রাজা ডেভিড ও রাজা সলোমন খ্রিস্টপূর্ব ৯২০ সন পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

অধিকৃত অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের সাহায্যে অনুপ্রবেশকারী ইহুদীরা এই অঞ্চলে কৃষিকাজের ও বসবাস গড়ে তোলার প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করে। প্যালেস্টাইনের অগাধ অঞ্চল আদিম অধিবাসীদের দখলেই থাকে।

খ্রিস্টপূর্ব ৯২৩ সন থেকে এই অঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয়। হিব্রু রাজত্বের বিরুদ্ধে খ্রিস্টপূর্ব ৭২২ সনে এসিরিয়ানস এবং খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সনে ব্যাবিলোনিয়ানরা আক্রমণ করে। প্যালেস্টাইনে হিব্রুদের শাসনের অবসান ঘটে। অল্পসংখ্যক হিব্রু প্যালেস্টাইনেই থেকে যায়। কিন্তু প্যালেস্টাইনের আদিম অধিবাসীদের কোনো যুদ্ধবিগ্রহই তাদের স্থানচ্যুত করতে পারে নি। এরপরে প্যালেস্টাইনের উপর আর যে ভিনটি বড় ধরনের আক্রমণ আসে সেগুলি হল, খ্রিস্টপূর্ব ৫০৮ সনে পারস্য রাজের আক্রমণ, খ্রিস্টপূর্ব ৩৩১ সনে আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে গ্রীকদের আক্রমণ এবং খ্রিস্টপূর্ব ৬৪ সনের রোমরাজের আক্রমণ।

৬৩৬ সাল থেকে প্যালেস্টাইন 'আরব প্যালেস্টাইন' বলে পরিচিতি লাভ করে এবং ঐরাণিক যুগ শুরু হয়। ১০৯৯ সালে জেরুজালেম শহর খ্রিস্টীয় ধর্মযোদ্ধারা দখল করে, কিন্তু ১১৮৭ সালে রাজা সালাদিন প্যালেস্টাইনের বিপুল অংশ থেকে এদের বিতাড়িত করে।

১৫১৭ সালে অটোমানদের রাজত্ব শুরু হয় এবং এই রাজত্ব ৪ ন বছর অর্থাৎ ১৯১৭ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

১৯১৭ সাল বিশ্বের ইতিহাসে নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনায় সমৃদ্ধ। ১৯১৭ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ এবং রাশিয়ার প্রথম শ্রমিকক্ষেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বছরেই প্যালেস্টাইনের আরব জনগণ ও অত্যন্ত আরব দেশগুলি অটোমান শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এই বিদ্রোহে প্রথম মহাযুদ্ধের মিত্রপক্ষরা সহযোগিতা করে। অটোমান রাজত্বের অবসান ঘটে। মিত্র পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে যুদ্ধ শেষ হলে প্যালেস্টাইনসহ অগাধ আরব দেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি কি পালিত হয়েছিল?

বিশ্বযুদ্ধের পর এই অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করে এবং এরই পরিণতিতে প্যালেস্টাইনে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী ( জিওনিস্ট ) রাষ্ট্র গড়ে ওঠে ।

### উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

১৮৯৭ সালে খিওভোর হারজল-এর সভাপতিত্বে সুইজারল্যান্ডের বাসল নগরে প্রথম উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । সম্মেলন থেকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :

“উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য হল প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জন্য জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা ।”

১৮৯৯ সালে ডেভিস অ্যিয়েক্স হারজলকে যে চিঠি লেখেন তা থেকে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদীদের কু-মতলব আরও পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ে । তিনি তাঁর চিঠিতে বলেন, “আমি আপনার কাছে একটা প্রস্তাব রাখতে চাইছি । আর সেটি হল খুব দেরি না করে ‘বৃহত্তর প্যালেস্টাইনের’ কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসা । বাসল-এ গৃহীত কর্মসূচীতে ‘বৃহত্তর প্যালেস্টাইন’ অথবা ‘প্যালেস্টাইন ও তার সংলগ্ন দেশগুলি’র উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, নতুবা এটার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই । আপনি ২৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার জমিতে ১ কোটি ইহুদীকে টাই দিতে পারবেন না ।”

আন্তর্জাতিক সম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা এসঙ্গে সম্মেলনের চেয়ারম্যান খিওভোর হারজল বলেন, “Were I to sum up the Basle congress in a word—which I shall guard from pronouncing publicly—it would be this : at Basle I founded the Jewish State.”

এই সম্মেলনে হারজল যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা ৫০ বছর পর ১৯৪৮ সালে বাস্তবায়িত হল । এই সময় ডেভিড বেন গুরিয়ন প্যালেস্টাইনের ভেল আভিভের মিউজিয়ম থেকে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন ।

এই লক্ষ্য বছরের মধ্যে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্যালেস্টাইনে তাদের রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য ইওরোপে ব্যাপক প্রচার শুরু করে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদের মনস্ত গিতে থাকে । অত্যধিক ইওরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের টেট ( অক্টোবর শতাব্দী ) উনবিংশ শতাব্দীতে আরব ছিনটায় এসে পৌঁছোয় । তৎকালীন অটোমান সাম্রাজ্যকে উচ্ছেদ করার জন্য যে ব্যাপক ও

গায়। যুদ্ধের পর মিত্রশক্তির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বাধীনতার বদলে ১৯১৯ সালে প্যালেস্টাইন ব্রিটিশের দখলে আসে—যা প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের সূচনা করে। কেননা ব্রিটিশ ও উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে অসীমতাভাব গড়ে ওঠে ও প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়ে যায়। এই সময় অর্থাৎ ১৯১৫ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত ইজিপ্টের ব্রিটিশ হাট-কমিশনারের সঙ্গে মকার রাজার বেশ কয়েকটি চিঠিপত্রের বিনিময় হয়। ব্রিটিশ হাট-কমিশনার এই চিঠি-পত্রের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনসহ পূর্ব আরবের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। আর এই ধরনের প্রতিশ্রুতি বেওয়ার পেছনের আসল উদ্দেশ্য হল মিত্রশক্তির সমর্থনে আরব জনগণকে যুদ্ধে নামানো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য সফল হয়, অর্থাৎ শেরিফ হুসেন ও ফায়েসল লিডেল হার্টের নেতৃত্বে আরবরা মিত্রশক্তির সমর্থনে যুদ্ধে নামে এবং তুরকের সেনাদলকে পরাস্ত করে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আরবদের দেয় প্রতিশ্রুতি পালন না করে ১৯১৬ সালে গোপনে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করে, যা সাইকস-পিকোট চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব আরব দু-দেশের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। ব্রিটেন সিরিয়া ও লেবাননের ওপর ফ্রান্সের অধিকার এবং তার বিনিময়ে ফ্রান্স ইরাকের ওপর ব্রিটেনের অধিকার স্বীকার করে নেয়। প্যালেস্টাইনকে আন্তর্জাতিক প্রশাসনের আওতার বাহ্যে রাখে। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনকে ইহুদী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার বিষয়টি নিয়ে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী সংস্থার সঙ্গে সল্য-পরামর্শ শুরু করে দেয়। আর এই সল্য-পরামর্শের কথা আরব ও ফ্রান্সের কাছে থেকেও গোপন রাখা হয়। আর তারই পরিণতি হিসেবে বেলফোর ঘোষণা—যা প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঢেকে দেয় এবং আরব জনগণের ওপর উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদের বীভৎস অভিযানের নেমে আসে।

১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর কুখ্যাত বেলফোর ঘোষণা জারি করা হয়। এই ঘোষণায় ইহুদী জনগণের জন্য প্যালেস্টাইনে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ৬৭টি লকস্মিনশ্ট এক ঘোষণায় প্যালেস্টাইনকে আরব জনগণের কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে বিদেশী ইহুদীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বেলফোর ঘোষণায় বলা হয় যে, "His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that

nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."

উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদীদের হাতে প্যালেস্টাইনকে যখন সমর্পণ করার চক্রান্ত হয় তখন অর্থাৎ ১৯১৮ সালে প্যালেস্টাইনে মোট জনসংখ্যার মাত্র ৮শতাংশ ( ৬,৪৪,০০০ আরব, ৫৬,০০০ ইহুদী ) ছিল ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত। আর এদের হাতে ছিল মোট জমির মাত্র আড়াই শতাংশ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ঘটনা নেমে আসে এবং ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়।

বাইরে থেকে কৃত্রিমভাবে ইহুদী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হলে প্যালেস্টাইনের নতুন মানচিত্রের দরকার হয়ে পড়ে এবং তার জন্য প্রধান পাঁচটি বিষয় অর্থাৎ জনসংখ্যা, জমি, স্থানীয় সংস্থাসমূহ, অর্থনীতি ও সামরিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বেলফোর ঘোষণার পর থেকে এই কাজটি অতি কৌশলের সঙ্গে চালাতে থাকে।

## জনসংখ্যা



ইহুদীদের জাতীয় বাসস্থানের ক্ষেত্র এবং উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের অনুপ্রবেশের কাজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় শুরু হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকার ইহুদীদের আইনগতভাবে অনুপ্রবেশের জন্য প্যালেস্টাইনের দরজা খুলে দেয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯১৮ সালে প্যালেস্টাইনে মাত্র ৫৬,০০০ জন অথবা মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ ছিল ইহুদী। চার বছর পর ব্রিটিশ সেনাদের ছত্রছায়ায় ইহুদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮৩,৭১৪ অথবা মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ হয়। ১৯৪৪ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৫৪,০০০ অথবা মোট জনসংখ্যার ৮১ শতাংশে পৌঁছায়। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় ইহুদীদের সংখ্যা ৬,৫০,০০০-এ পৌঁছায়।

১৯২৯ সালে আরব বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে সা কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেই আরবদের

বিস্ত্রোহ ঘটে। স্য। কমিশন ব্রিটিশ সরকারের কাছে ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে আগমন নিয়ন্ত্রণ করার এবং অইহুদীদের স্বার্থ আলোচনা করার সুপারিশ করে। কিন্তু সব সুপারিশ উপেক্ষা করেই প্যালেস্টাইনে ইহুদী অনুপ্রবেশ চলতে থাকে।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ১৯১৮ সালে যখন প্যালেস্টাইনে নিজেদের উপ-নিবেশ গড়ে তোলে তখন প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল ৫৬ হাজার; আর ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইন ত্যাগ করার সময় সাড়ে ৬ লক্ষ ইহুদীকে প্যালেস্টাইনে বসবাসের সুযোগ করে দিয়ে ইসরায়েল রাষ্ট্র গড়ে তুলতে প্রত্যক্ষ সাহায্য করে।

## জমি

প্যালেস্টাইনের মানচিত্র পরিবর্তনের দ্বিতীয় পদক্ষেপ জমির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। বাইরে থেকে যে-আইনীভাবে ইহুদী অনুপ্রবেশের সঙ্গে তাদের জমি দেওয়ার প্রস্তুতিও স্বভাবতই এসে যায়।

ব্রিটিশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী ১৯১৮ সালে প্যালেস্টাইনের মোট জমির মাত্র আড়াই শতাংশ ছিল ইহুদীদের হাতে। ১৯৪৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৬ শতাংশে দাঁড়ায়।

ব্রিটিশ সরকার এই সময় ইহুদীদের কাছে আরবদের জমি বিক্রি করতে বাধ্য করে। এ ছাড়াও ১৯২০ সালে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনে জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত এক অর্ডিন্যান্স চালু করে।

## উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী সংস্থা

প্যালেস্টাইনের মানচিত্র পরিবর্তনের অষ্ট তৃতীয় পদক্ষেপ হিসেবে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী সংস্থা গড়ে তোলা হয়। ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনের প্রশাসনিক কাজে সহযোগিতা ও উপদেশ গ্রহণের অষ্ট উপস্থল উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী এজেন্সিকে স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করে। উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী সংস্থাকেই এজেন্সি বলে গ্রহণ করে।

ফলে প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ প্রশাসনে ইহুদীদের গ্রহণ করা হল, অষ্ট দিকে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই আরবদের প্রশাসন থেকে বাইরে রাখা হল। ইহুদী

জাতীয়তাবাদী এজেন্সিকে বাড়িতে সুযোগ দেওয়া হল যার ফলে ব্রিটিশ প্রশাসনের অতিষ্ঠ রাষ্ট্রের মধ্যে রাই গড়ে উঠল।

### অর্থনীতি

চতুর্থ পদক্ষেপ হল প্যালেস্টাইনে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী অর্থনীতি এমনভাবে গড়ে তোলা দরকার যাতে ভবিষ্যতে ইসরায়েল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ হিসাবে কাজে লাগতে পারে। সেই কারণে ব্রিটিশ প্রশাসকরা প্যালেস্টাইনের প্রধান সম্পদগুলিকে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী কোম্পানিগুলির নিয়ন্ত্রণে নিতে আসে। তার একটি উদাহরণ হল প্যালেস্টাইনের বিদ্যুৎ প্রকল্প। এছাড়া ডেড সাঁর খনিজ সম্পদও ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। অর্থাৎ প্রধান প্রধান শিল্পে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদীরা একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

### সামরিক শক্তি

পঞ্চম পদক্ষেপ হিসেবে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী সামরিক শক্তি চুই উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়। একটি হল, ক্রমবর্ধমান ইহুদী বাসিন্দাদের বাস করা এবং ঘিতিয়টি হল, সময় উপস্থিত হলে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক শক্তিকে সৃষ্টি করে তোলা। এই কারণে ১৯১৮ সালে ব্রিটিশের সহায়তায় ইহুদীদের সশস্ত্র দল প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করে।

১৯২০ সালে ব্রিটিশ প্রশাসন ইহুদীদের সামরিক সংস্থা গড়ে তোলার অনুমতি দেয় বা হাভানা বাহিনী বলে পরে পরিচিত হয়।

১৯০৬ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত প্যালেস্টাইন আরবদের যে অভ্যুত্থান তাকে দমন করার জন্য ১৯৩৭ সালে অনেক ব্রিটিশ অফিসার অর্ধে উইনগেট হাওয়ান বাহিনীকে সামরিক শিক্ষার শিক্ষিত করে তোলে। বিত্তীয় বিঘ্নবৃত্তের সময় উইনগেট চাচিল ৩০ রাজার দৈন্য সমন্বিত ইহুদী বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

প্যালেস্টাইনে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদীদের সামরিক সংস্থাগুলিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে, তখন অন্যদিকে প্যালেস্টাইনের যাত্রা আসল বাসিন্দা সেই আরবদের কাছে অস্ত্র রাখা ছিল সম্পূর্ণ বে-আইনী। অস্ত্র রাখার অপরাধে প্যালেস্টাইন আরবদের গাঁসিকাঠেও খুলতে হয়েছে।

১৯০৬ সালে সংঘটিত প্যালেস্টাইন অভিযানের প্রেক্ষাপটে গঠিত ব্রিটিশ সরকারের রয়্যাল কমিটি প্যালেস্টাইনকে আরব ও ইহুদী এই দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয়। প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আরবদের মধ্যে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে। আবার এই সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ব্রিটিশের পক্ষে আরবদের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই দুই কারণে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩২ সালে প্যালেস্টাইন বিভক্ত করার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিয়ে এক দ্বৈতপত্র প্রকাশ করে।

ব্রিটিশের এই নতুন কৌশল কিন্তু উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদ মেনে নিতে পারে নি। তারা তৎক্ষণাৎ দ্বৈতপত্রকে অস্বীকার করে এবং নিজেদের স্বাধীনতার অঙ্গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে ধরনা দেয়। ১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদীদের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

এখন থেকে প্যালেস্টাইন আরব জনগণের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও যুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট হারি ট্রুম্যানের নেতৃত্বে মার্কিন, উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী ও ব্রিটিশের নতুন আভ্যন্তরীণ প্যালেস্টাইনকে দু'টুকরো করার নতুন উদ্যোগ নেয়।

### জাতিসংঘে প্যালেস্টাইন ভাগের প্রস্তাব

১৯৪৭ সালের এপ্রিলে ব্রিটেন জাতিসংঘের আলোচ্য-সূচীতে প্যালেস্টাইন ভাগ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে এবং তা গৃহীত হয়। ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্যালেস্টাইনকে আরব ও ইহুদী রাষ্ট্রে ভাগ করা এবং জেরুজালেম অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক অঞ্চল বলে গণ্য করার প্রস্তাব অনুমোদন করে। জাতিসংঘের এই সিদ্ধান্তের পেছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ হাত ছিল। এই সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জাতিসংঘে প্যালেস্টাইনকে দু'টুকরো করার প্রস্তাবকে অনুমোদন করানোর জন্য মার্শাল প্লানকে কাজে লাগায়।

এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হারি ট্রুম্যান তাঁর ডায়েরীতে কি বলেছেন তা দেখা যাক—তিনি ‘Years of Trial and Hope’ নামক তাঁর ডায়েরীতে বলেছেন, “Top Jewish leaders in the United States were putting all sorts of pressure on me to commit American power and forces on behalf of Jewish aspirations in Palestine”...

প্যালেস্টাইন ভাগ করার কাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি ভূমিকা নিয়েছিল এবং তার পেছনে কারা ছিল তা প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিজের লেখা থেকেই পরিচয় হতে গেছে।

প্যালেস্টাইনকে ভাগ করার পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যালেস্টাইনের ৫৬'৪৭ শতাংশ অঞ্চল ইহুদীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। বাকি অংশটা থাকে প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের জন্য। কালনেমির লব্ধা ভাগের মতো বিদেশীদের জন্য একটা দেশের বেশির ভাগ অংশটাকে ছেড়ে দেওয়া হয় আর বাদে দেশ তাদের ভাগে) আট সামান্য অংশ। একেই বলে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। যে অঞ্চলটি ইহুদীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়, সেখানে আরব ও ইহুদীদের সংখ্যা সমান রাখা হয়। প্রায় ৫ লক্ষ ইহুদীকে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

একবার পেছনের ইতিহাসটার দিকে তাকিয়ে দেখুন, ১৯১৮ সালে প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল ৫৬ হাজার—আর ১৯৪৭ সালে তাকে করা হয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ। আর তার সঙ্গে প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের কেড়ে নেওয়া হল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার।

## ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে উগ্র ইহুদী

### জাতীয়তাবাদীদের আক্রমণ ও সম্ভাব

১৯৪৭ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘে প্যালেস্টাইন ভাগ করার পরিকল্পনা অনুমোদিত হওয়ার পর এবং ১৯৪৮ সালের মে মাসে ইসরাইল রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এই ৬ মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্যরা ইহুদী অঞ্চল থেকে ক্রমশ আরব অঞ্চলে সরে যেতে থাকে। আর তারই সুযোগ নেয় ইহুদীরা। ইহুদীরা ব্রিটিশ সৈন্যদের ছত্রছায়ায় যতটা সম্ভব বেশি প্যালেস্টাইনের জমি দখল করতে থাকে। অন্যদিকে আরব অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন থাকায় আরবরা যে-কোনো ধরনের প্রতিরোধ থেকে বঞ্চিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চালাকি সম্পর্কে ইহুদী লেখক কি লিখেছেন তা দেখা যাক। ইহুদী লেখক মোশে মেনুহিন ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহার সম্পর্কে বলেছেন, "They progressively abandoned strong-point after strong-point.... These were to be handed over to the new administrations of the respective areas, but often---they fell into the hands of those

who got there first. Generally...the Zionists...got the better of the game. It was a kind of jockeying into position for the coming show down.” এই ছ মাসের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীদের এখানে আনা হল—যারা এল তাদের মধ্যে বিশেষজ্ঞরা ছাড়াও সেনা, নৌ ও বিমান অফিসাররা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর এদেরই সাহায্যে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গড়ে তোলার ভিত্তি তৈরি হল।

একদিকে প্যালেস্টাইনে বিদেশী ডাড়াটোদের ভিড় বাড়তে লাগল, অন্যদিকে আরবদের উপর শুরু হল সন্ত্রাসের অভিযান। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে দেইর-ইয়্যাসিনের হত্যাকাণ্ডে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ চমকে উঠেছিল। দেইর-ইয়্যাসিনের হত্যাকাণ্ড থেকে একটি লিখ্ত পর্যন্ত রেহাই পায় নি। ইহুদী লেখক জন কিমচে তাঁর বই ‘The Seven fallen Pillars’ নামক পুস্তকে লিখেছেন, “The darkest stain on the Jewish record.”

ঊষ ইহুদী জাতীয়তাবাদীদের এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল আরবদের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়ানো। লক্ষ্য পূরণও হল; এই আক্রমণের ফলে শান্তি-প্রিয় আরবরা তাদের মাতৃভূমি প্যালেস্টাইন ছেড়ে আসতে শুরু করল। ১৯৪৮ সালের ১৫ মে যেদিন ব্রিটিশ বাহিনী প্যালেস্টাইন থেকে চলে গেল সেদিন হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে ৪ লক্ষেরও বেশি আরব জনগণ তাদের মাতৃভূমি ইতোমধ্যেই পরিত্যাগ করে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে উদ্বাস্তু হয়ে বসবাস করছে। আর তাদেরই মাতৃভূমিতে অবাধে বিচরণ করছে ইহুদীরা। এই দিনটার আগের দিন অর্থাৎ ১৪ মে প্যালেস্টাইনের জনগণের কাছে “কালো দিন” বলে পরিচিত। কেননা এই দিনেই ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষিত হয়।

অন্যদিকে একাধিক আরব রাষ্ট্র প্যালেস্টাইনের আরবদের সমর্থনে এগিয়ে এলেও শেষ পর্যন্ত প্রধানত তিনটি কারণে ঊষ ইহুদী জাতীয়তাবাদীদের হাতে তাদের পর্য্যদন্ত হতে হয়। প্রথমটি হল, আরব বাহিনী ছিল সংখ্যায় কম; দ্বিতীয় কারণ হল জাতিসংঘের বিশ্বাসঘাতকতা। সর্বশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল, বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের পীটছড়া।

১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের মুক্তিযুদ্ধ চুক্তি হয়। কিন্তু পরে ইসরায়েল এই চুক্তি ভঙ্গ করে ইজিপ্ট ক্রান্ত আক্রমণ করে নাজেদের সম্পূর্ণ অঞ্চলটা দখল করে নেয়। এভাবেই ঊষ ইহুদী

জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি সহায়তায় প্যালেস্টাইন দখল করে নিজেদের রাষ্ট্র 'ইসরায়েল' গঠন করে, আর সাড়ে ৭ লক্ষ প্যালেস্টাইন আরবদের উদ্বাস্তুতে পরিণত করে।

এই সময় জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল হাকারজনক। প্রথমত জাতিসংঘ প্যালেস্টাইন ভাগ করার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে মানবিক অধিকার ভঙ্গ করে এবং পরে ইসরায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়।

১৯৪৯ সালের ১২ মে ইসরায়েল রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদীরা রাষ্ট্র ইসরায়েল ফেলিস্তিনীয়দের ও প্রান্তবর্শী আরব দেশগুলির বিরুদ্ধে বার বার আক্রমণ চালায়, কিন্তু জাতিসংঘ ইসরায়েলীদের এই আক্রমণাত্মক অভিযান প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। ইসরায়েল এই সময়ের মধ্যে জাতিসংঘের ১৬০টি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে তাদের আগ্রাসন নীতি অব্যাহত রাখে।

উপনিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদীদের আক্রমণের ফলে নিরস্ত্র ও শান্তিপ্রিয় ফেলিস্তিনীয়দের উদ্বাস্তু হিসাবে বিভিন্ন আরব দেশে চলে আসতে হয় এবং ক্যাম্প ও শিবিরে দিনযাপন করতে হয়। মোট ৫৫ লক্ষ ফেলিস্তিনীয় অধিবাসীর মধ্যে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি ফেলিস্তিনীয়কে যুদ্ধে ছেড়ে অন্তর্গত উদ্বাস্তুর জীবনযাপন করতে হচ্ছে; আর বারো যুদ্ধেও গেছে তারা নিজের দেশেও পরাধীন।

ফেলিস্তিনীয়রা কোথায় কোথায় ছড়িয়ে আছে (১৯৭৩ সালের হিসাব) তার একটা পরিসংখ্যান ২৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া হল—

### ফেলিস্তিনীয় জনগণের ঐক্য

উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদীদের সন্ত্রাস ও আক্রমণের দরুন ফেলিস্তিনীয়রা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লেও তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয় নি। আর এই ঐক্য বিনষ্ট না হওয়ার কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হল :—

১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তারা একটি দেশে বাস করত—যে দেশটির নাম প্যালেস্টাইন। সামগ্রিক আরব সমাজের মধ্যে প্যালেস্টাইনের একটা নিজস্ব চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল।

দুনিয়ার যে অঞ্চলেই ছড়িয়ে পড়ুক না কেন, তারা মনেপ্রাণে অসুস্থ করত যে, একদল বিদেশী অনুপ্রবেশকারী তাদের দেশ থেকে জোর করে

উৎখাত করেছে এবং একদিন না একদিন তাদের মাতৃভূমিতে ফিরতেই হবে।

অন্য দেশে উন্নত হিসাবে বাস করা সত্ত্বেও ফেলিস্তিনীয়রা তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেয় নি। বিশেষ করে অন্ত্য আর্ব দেশে তাদের ক্যাম্পজীবন এই কাজে বিশেষ সাহায্য করেছে।

অন্যদিকে হতভাগ্য ফেলিস্তিনীয়দের জাতীয় সত্তাকে বহুদিন যাবৎ কোনো দেশ স্বীকৃতি দেয় নি। উপরন্তু তাদের উন্নত হিসাবে দেখা হয়েছে। অবশ্য, এই অবস্থা বেশদিন চলতে পারে নি। কেননা উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ফেলিস্তিনীয়দের নিরলস সামরিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে নাড়া দিতে সক্ষম হই।

ফেলিস্তিনীয়দের অস্তিত্ব মুছে গেছে বলে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদীদের নিল'জ প্রচার বেশদিন ঠাই পাই নি। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক শিবির

২৮ পৃষ্ঠার পরিসংখ্যান—

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| ট্রান্সজর্ডান        | ১,০০০,০০০ |
| এরেষ্ট ব্যাক         | ৭১৬,০০০   |
| গাজা                 | ৩৬৭,০০০   |
| ইসরায়েল             | ৪০০,০০০   |
| লেবানন               | ৩০০,০০০   |
| সিরিয়া              | ২০০,০০০   |
| কুদায়েত             | ১৮০,০০০   |
| হিজপ্ট               | ৩৫,০০০    |
| ইরাক                 | ১৮,০০০    |
| আরবীয় উপসাগর        | ১৫,০০০    |
| পিবিয়া              | ১৫,০০০    |
| সৌদি আরব             | ২০,০০০    |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২৫,০০০    |
| জাতিতন আমেরিকা       | ৭,০০০     |
| পশ্চিম জার্মানি      | ১৫,০০০    |

মোট

৩,৩১০,০০০

থেকে প্রথমে এই প্রচারণকে মিথ্যা প্রচার বলে ঘোষণা করা হয় এবং দখলী আরব ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলকে সরে আসার দাবি জানানো হয়।

অতীতকে ছাড়িয়ে পড়া ফেলিস্তিনীয়রাও উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য একটা ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব খুঁজতে থাকে। কেননা তারা অনুভব করে যে, তাদের শ্বাসসঙ্গত দাবি আরব ও তুনিয়ার অত্যন্ত বেশতালিতে উপেক্ষিত। ফেলিস্তিনীয়দের এই অনুভূতি ১৯৬৪ সালের ২৮ মে বাস্তবায়িত হয়। এই দিন জেরুজালেমে ফেলিস্তিনীয়দের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩৮ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। বিভিন্ন দেশের ফেলিস্তিনীয় কমিটিগুলি তাদের প্রতিনিধি নির্ধারণ করে কংগ্রেসে পাঠায়।

এই কংগ্রেসেই ফেলিস্তিনীয় মুক্তি সংস্থা (পি এল ও) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্যালেস্টাইন জাতীয় সনদ রচিত হয়। জাতীয় সনদের মৌলিক নিরঙ্কর (ক্লস) ২৬ ধারায় বলা হয় যে, "This organisation will be responsible for the movement of the Palestinian people in their struggle to liberate their country, in all fields of liberation—political, organisational and financial—and in whatever the Palestinian cause requires on the Arab and international levels." ৪নং ধারায় ঘোষণা করা হয়, "All Palestinians are natural members of the P. L. O.—and the Palestinian people are the broad base for the organisation."

ফেলিস্তিনীয় মুক্তি সংস্থার (পি এল ও) সৃষ্টি ফেলিস্তিনীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্বরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করে। ফেলিস্তিনীয় জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে পি এল ও গড়ে ওঠে।

পি এল ও-র বৈধতা সম্পর্কে সাত্রাজবাদী ও উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী মহল থেকে যেসব প্রশ্ন ওঠে তা অচিরেই নাকচ হয়ে যায়, কেননা প্রথমত অনেকগুলি দেশ এবং কয়েকটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা পি এল ও-কে স্বীকৃতি দেয়; এবং দ্বিতীয়ত ফেলিস্তিনীয় জনগণ পি এল ও-কে তাদের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি মূলক সংস্থা বলে ঘোষণা করে।

পি এল ও-র জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই সরকারিভাবে আরব তুনিয়া থেকে একে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৯৬৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আলেকজান্দ্রিয়ায়

আরব লীগের এই স্বীকৃতি পি এল ও-কে অত্যন্ত আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে সম-  
মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে।

অন্যদিকে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে ফেলিস্তিনীয়দের সংগ্রাম  
১৯৬৫ সালে নতুন মোড় নেয়। ফেলিস্তিনীয় প্রতিরোধকাহীরা (ফেদাইন)  
ইসরায়েল-অধিকৃত আরব অঞ্চলগুলির ওপর আক্রমণ শুরু করে।

আর-একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল যে, ফেলিস্তিনীয় জাতীয় ফ্রন্টের  
প্রতিনিধিরা ফেলিস্তিনীয় জাতীয় পরিষদের সভায় (১৯৭৪) প্রথম যোগ  
দেয়। এই সংগঠনটি ইসরায়েল-অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক মুক্তি-সংগ্রামের পরি-  
চালক। প্যালেস্টাইনের বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তিগুলির প্রতিনিধিদের ও  
বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে এই ফ্রন্টটি গঠিত। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে  
লিখিত এক পত্রে স্থাননাল ফ্রন্ট পি এল ও-কে সমর্থন জানায়। ইসরায়েল-  
অধিকৃত অঞ্চলের এই মুক্তি-সংগ্রামটি (স্থাননাল ফ্রন্ট) ছাড়াও জেরুজালেমের  
ইসলামিক হাযার কাউন্সিলও পি এল ও-কে সমর্থন জানায়।

ফলে পি এল ও-কে ফেলিস্তিনীয় জনবলের একমাত্র জাতীয় সংস্থা বলা  
ছাড়া আর কোনো ভাষা থাকে না।

পি এল ও-র জন্মের পর তার অগ্রগতি যেমন বাড়তে থাকে—তেমনি উগ্র  
ইহুদী জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েলও তার উপনিবেশকে আরও বিস্তার  
করার জন্য সাঁত্ৰাজ্যবাদীদের সাহায্য নিয়ে সামরিক বাহিনীকে পুষ্ট করতে  
থাকে। আর তারই পরিণতি ঘটে ১৯৬৭ সালের ৫ জুন।

এই দিন ইসরায়েল তার পার্শ্ববর্তী তিনটি আরব রাষ্ট্রের ইজিপ্ট, সিরিয়া ও  
জর্ডানের ওপর বুলশং আক্রমণ শুরু করে। জর্ডানের ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক, গাজা স্ট্রিপ,  
সিরিয় হাইটস ও সিনাই ইসরায়েলীরা দখল করে নেয়।

ইসরায়েলীরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলকে আরও বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যেই এই  
আক্রমণ পরিচালনা করে এবং এই আক্রমণের প্রযুক্তি তারা যে অনেকদিন আগে  
থেকেই শুরু করেছিল তা ইসরায়েলী বিমানবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল  
হোডের উক্তি থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, "Sixteen years'  
planning had gone into those initial 80 minutes, ( the air strikes  
on 5 June, 1967 ). We lived with the plan, we slept on the  
plan, we ate the plan, constantly we perfected it." ( Sunday  
Times, 16 July 1967 )

১৯৬৭ সালে ইসরায়েলী উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদীদের এই আক্রমণের পরিণতি হিসাবে ৪১০,০০০ কেলভিস্তানীকে জর্ডান ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজা থেকে পালিয়ে আসতে হয় এবং ইস্ট ব্যাঙ্কে উদ্বাস্তু হিসাবে বসবাস করতে হয়।

ইসরায়েলের এই আক্রমণের এবং নতুন অঞ্চল দখলের বিরুদ্ধে দুনিয়ার বিশেষ করে আরব ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে সোচ্চার প্রতিবাদ জনিত হয়। ১৯৬৭ সালের ২২ নভেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ দখলী অঞ্চল থেকে সরে আসার জন্য ইসরায়েলের কাছে দাবি করে। আর সেই দাবির জবাবে ইসরায়েলী পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবান ইবান উদ্ধৃতভাবে ঘোষণা করেন যে, "If the General Assembly were to vote by 121 votes to 1 in favour of 'Israel' returning to the armistice lines (pre June 1967 borders)—Israel would refuse to comply with that decision." (New York Times, 19 June 1967)

১৯৬৭ সালে ইসরায়েলী আক্রমণের পর আরব দুনিয়ায় নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সেই পরিস্থিতি হল—আরব দুনিয়ার সঙ্গে ইসরায়েলের মুখোমুখি সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদ ইসরায়েলের পক্ষাবলম্বন করেছে। সাম্রাজ্যবাদের এই পক্ষাবলম্বন ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। কেননা আরব দুনিয়ার অধিকাংশ দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা বর্তমান বিশ্বে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আর আরব দুনিয়ার এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকার দৃশ্য বিশ্বের ভেতের ভাঁটার সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে সরে গেছে। তাই সাম্রাজ্যবাদকে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে আরব দুনিয়ার বিরুদ্ধে লুম্বিক দিতে হচ্ছে।

অতীতকে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক শিবির ও তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদের অ'ভাতের বিরুদ্ধে অবিস্তার প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। জাতিসংঘে প্যালেস্টাইন ও ইসরায়েলের প্রায়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়তে হয়েছে। যে জাতিসংঘ ১৯৪৭ সালে প্যালেস্টাইনকে দু টুকরো করার প্রস্তাব অনুমোদন করে সেই জাতিসংঘে বর্তমানে ইসরায়েলের আগ্রাসন নীতির বিরুদ্ধে এবং প্যালেস্টাইনের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবির সমর্থনে দাঁড়িয়েছে। এমন কি উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদকে জাতি-বিশ্বের বলে আখ্যা দিতেও জাতিসংঘ কঠোবধ করে নি।

বিশ্ব জুড়ে প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবির সমর্থনে যে জনমত্ত গড়ে উঠেছে, তা উপেক্ষা করেই উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় তাদের আগ্রাসী নীতি অব্যাহত রেখেছে। এমন কি, তারা অর্থাৎ ইসরায়েল ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ লেবাননকে দু'টুকরো করে তাদের কাজ হাসিল করার জন্ম লেবাননে গৃহযুদ্ধের উসকানি দিচ্ছে। আর ভারই পরিণতি হিসাবে লেবাননে বর্তমান অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ফালাঞ্জিস্টরা অর্থাৎ লেবাননের প্রতিক্রিয়ামূলক দক্ষিণপন্থী দলের সমর্থকরা ইসরায়েল ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় দেশের বামনহু, প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিকদের ওপর হামলা শুরু করেছে। এমন কি মাঝে মাঝে তারা ফেলিস্তিনীয় শিবিরগুলির ওপরও হামলা চালাচ্ছে।

বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অগতম সহচর হিসাবে আরব দুনিয়ার অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে। তাই সাম্রাজ্যবাদ থেকে উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। ইসরায়েল বর্তমানে কেবল একটি ইহুদী রাষ্ট্রমাত্র নয়—বিশেষ লক্ষ্যসহ একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। আর এই লক্ষ্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মূল রণনীতি থেকে আগো বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদ ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সাম্রাজ্যবানবিরোধী সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর সেজন্যই ফেলিস্তিনীয়দের সশস্ত্র সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্যালেস্টাইন সমস্যার একটা গণতান্ত্রিক সমাধানের উদ্দেশ্যেই ফেলিস্তিনীয়দের সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ প্যালেস্টাইন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এই সংগ্রাম। আর এই গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ প্যালেস্টাইনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান সুযোগ পাবে। ১৯৬৮ সালে আবু আক্বর (ইয়াদের আরাক্ত) ঘোষণা করেছিলেন, "Moslems and Christians are living side by side in the Arab countries. I believe that Jews have the same choice.. In the past, they lived peacefully in Arab Palestine without being subject to any racial or religions discrimination. This situation remained till the emergence of Zionism. We intend to build our country with

no racial or religious discrimination." ( Al Anwar, Beirut 23 June 1968 )

১৯৬৮ সালে ইস্রায়েলের আরাফতের ঘোষণার পর বহু বছর কেটে গেলেও পি এল ও ভবিষ্যৎ প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র সম্পর্কে এখনও এই নীতি অনুসরণ করে চলেছে। ইহুদীদের ওপর নাৎসি জাধানির চরম অত্যাচার সেই সময় বিশ্বের বিবেকবান প্রতিটি মানুষকে গভীরভাবে ব্যথিত করে তুলেছিল। ইহুদীদের প্রতি একটা স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা গড়ে উঠেছিল। তাই ভারতের মাটিও যেদিন দু'টুকরো হল—আর হাজার হাজার উগ্রাঙ্গ এ দেশে এল, তখন এদের জীবনকে 'নতুন ইহুদী' নামে আমরা আখ্যায়িত করেছিলাম।

আর বর্তমানে প্যালেস্টাইনের নিরীহ ও শাস্তিপ্রিয় নাগরিকদের দেশছাড়া যারা করেছে—ফেলিগিনীয়দের যারা উগ্রাঙ্গ করে ছেড়েছে তারা শুধু ইহুদী নয়—'ঊগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদী'—যার অপর নাম ইসরায়েল—আরব জগতের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। সাধারণ ইহুদী যারা—তাদেরও এরা শত্রু। তাই পি এল ও ঘোষণা করেছে যে, তাদের সংগ্রাম ইহুদীদের বিরুদ্ধে নয়—ঊগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে—যার অপর নাম ইসরায়েল ও তার নীতি হল সাম্রাজ্যবাদী। The Palestine Question নামক বইয়ের ৭০পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'This solution ( new democratic Palestine ), that the Palestine people seek, does not constitute just a fulfilment of their right to self-determination, it also leads to the liberation of Jews from Zionism—an ideology which imposes on them an outlook based on racism, distrust and a "ghetto mentality", such a Zionist outlook offers them only one alternative: to continuously live with gun in hand, feeding animosity with animosity. This solution liberates them also from being a pliant tool in the hands of Imperialism. It is this that gives the Palestinian revolution its fully humanistic content—it is a means for liberating Arabs and Jews together. The democratic solution means the elimination of the privileges of the oppressor, but not the exchange of one oppression for another.'

---

( The Palestine Liberation organisation, The Palestine Question, Palestine : Illustrated political history, These are the Palestinians নামক পত্রিকাগুলি থেকে নেওয়া বাক্যগুলি )

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৫শ  
কংগ্রেসের দৃষ্টিতে

জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম

“এটিই প্রধান কথা যে কাছত অনেক দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভয়বিধ শোষণমূলক সম্পর্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসাবে বিকাশ লাভ করতে শুরু করেছে”।

“মহান লেনিনের ঐতিহাসিক যে ঔপনিবেশিক ও পরনির্ভরশীল দেশগুলির জনগণ, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম আরম্ভ করে, ক্রমে ক্রমে শোষণব্যবস্থার ভিত্তিমূলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিকে ধাবিত হবে তা আজ সত্যে পরিণত হতে চলেছে”।

(সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৪শ কংগ্রেসে প্রদত্ত  
ব্রেকেনেভের রিপোর্ট থেকে)

কমরেডগণ, যেসব দেশ ঔপনিবেশিক অধীনতাপাল থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে তাদের সঙ্গে, কিংবা অপূর্ণ সংজ্ঞা মোতাবেক, উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক-বন্ধন আলোচ্য কালপর্বে বহুগুণ বেড়েছে এবং অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হল, আমাদের সম্পর্ক-বন্ধনের রাজনৈতিক আধেয়টি সমৃদ্ধতর হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও বৈদেশিক কর্মনীতিতে গুরুতর পরিবর্তনসমূহ এদের সঙ্গে অধিকতর জোড়দার সহযোগিতার পথ নিঃসন্দেহে সূচয় করেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনেকগুলি মুক্ত দেশে পরিবর্তনের প্রধান প্রধান প্রবণতাগুলি কি কি? শিল্পোন্নয়নের অভিকর্ষ কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয়ত্ব সেটায়ের স্থানান্তরণ, সামন্ততান্ত্রিক ভূমির মালিকানার অবলোপ, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নবীন রাষ্ট্রগুলির কার্যকরী সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিদেশী প্রতিষ্ঠান

অসুবিধা সত্ত্বেও পৃথিবীর সেই অংশে বুরপ্রদারী প্রগতিশীল পরিবর্তনসমূহ সংঘটিত হচ্ছে। এ নিশ্চিতভাবেই ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি প্রক্রিয়া।

অনেকগুলি মুক্ত দেশে শ্রেণীগত পৃথক্‌ত্ববনের একটি জটিল প্রক্রিয়া চলছে, শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বেড়ে চলেছে। এ নানা রূপ নিচ্ছে। সমাজতন্ত্র-অভিযুখীনতা সম্পন্ন আরব, আফ্রিকান ও এশীয় দেশগুলিতে আর্থ-ব্যয়সা ও রাজনৈতিক জীর্ণন নতুন নতুন প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটিচ্ছে। কিন্তু এমনসব দেশও রয়েছে যেখানে ঘটনা-বিকাশ পুঞ্জিবাদী পথ অনুসরণ করছে।

সমাজতাত্ত্বিক লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করেছিল এবং প্রগতিশীল পরিবর্তন কার্যকর করছে এমন কিছু কিছু সরকার ও রাজনৈতিক সংগঠনের উপর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রতিজ্ঞার প্রবল চাপ আসছে। স্ত্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক দক্ষিণপন্থী অভিযান, এবং মিশরী বিপ্লবের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাপ্তিসমূহের ভিত কইরে নেবার চেষ্টা ঘটনাবলীর এই গতিপথের উদাহরণ।

কিংবা বর্তন আঙ্গোলা লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্রের কথা, সবেমাত্র গঠিত এই প্রগতিশীল রাষ্ট্রটি বৈদেশিক হস্তক্ষেপের লক্ষ্যবস্ত্ত হয়েছিল। এই হস্তক্ষেপ রাষ্ট্রীয় আফ্রিকার মাত্রাত্মক শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য-বাদীদের, এবং হারা ওদের দালালের কুৎসিত দাষ্টিত্ব পালন করেছিল তাদেরও কাজ। এই কারণেই রাষ্ট্রীয়তার জগৎ আঙ্গোলার সংগ্রামকে সমর্থন করেছিল পৃথিবীর প্রগতিকামী শক্তিগুলি, এবং এর দাফল্য আরও একবার প্রমাণ করেছে কোন কিছুই জাতিসমূহের মুক্তি কামনাতে চূর্ণ করতে পারে না।

উন্নয়নশীল দেশগুলির অভ্যন্তরে জটিল প্রক্রিয়াসমূহের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোভাব স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্ত্যস্ত দেশ ও জাতির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলার না। প্রতিটি জাতির, প্রতিটি দেশের বিকাশের নিজস্ব উপায় রয়েছে নেবার পবিত্র অধিকার সম্পর্কে এ আমাদের লেনিনবাদী পররাষ্ট্র নীতির অপরিবর্তনীয় নীতি। কিন্তু আমরা আমাদের মতামত প্রকাশই না। অসংসব স্থানের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আমরা রয়েছি প্রগতি, গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধীনতার শক্তিগুলির পক্ষে, এবং আমরা তাদের বন্ধু ও সংগ্রামের সাথী বলে গণ্য করি।

আমাদের পাঠি মুক্তির জগৎ সংগ্রামরত জাতিগুলিকে সমর্থন করে ও

খোঁজে না, সুবিধা পাবার ফিকিরে ঘোরে না, রাজনৈতিক প্রভু চায় না কিংবা সামরিক ঘাটি আদায় করে না। আমরা কাজ করি আমাদের বৈশ্ববিক বিবেকের, আমাদের কমিউনিস্ট বিশ্বাসের ভাগিদে।

‘আধুনিক দুনিয়ার চিত্রের দিকে তাকিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি লক্ষ্য না করে পারা যায় না যে, যেসব রাষ্ট্র যাত্রা হাঁলে উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশ ছিল তাদের প্রত্যেক উল্লেখযোগ্যরূপে বেড়েছে।’

এসব দেশের অধিকাংশ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে যে, তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান শক্তি নিয়ে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করছে, তাদের স্বাধীনতা সুসংহত করতে এবং তাদের জাতি-গুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরু উন্নীত করতে চেষ্টা করছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির পররাষ্ট্র নীতি দৃষ্টতই অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এ দেখতে পাওয়া যাবে বহু ক্ষেত্রে—জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের রাজনৈতিক কবলতা, এবং আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা ও উন্নয়নশীল দেশগুলি কর্তৃক গঠিত নানা অর্থনৈতিক সমিতির কার্যকলাপের মধ্যে। এখন এটা একেবারেই স্পষ্ট যে পৃথিবীর শ্রেণীলব্ধিগুলির বর্তমান পরস্পর সম্পর্ক যেকোনো ভাবে মুক্ত দেশ-গুলি সাম্রাজ্যবাদী আদেশ প্রতিরোধ করতে এবং তাব্য, অর্থাৎ সমতাপূর্ণ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক অর্জন করতে সমর্থ। এটাও পরিষ্কার যে শান্তি ও জাতিসমূহের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত সংগ্রামে তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান আরও বেশি সার-বান হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

আমাদের কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে আমরা আবার জোর দিয়ে বলছি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন নবীন রাষ্ট্রগুলির শ্রম্য আশা-আকাঙ্ক্ষাকে, সকল সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কেড়ে ফেলবার দৃঢ় সংকল্পকে এবং তাদের নিজস্ব জাতীয় সম্পদের পূর্ণ কৃতিত্ব নিজে তাদের দৃঢ় সংকল্পকে পুরোপুরি সমর্থন করে।

আরও দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে দু-একটি কথা বলতে চাই। গত ১৭টি বছরে আমাদের ও সিরিয়ার মধ্যে ভালো পারস্পরিক বোঝাপড়ার উদ্ভব হয়েছে। অনেক আন্তর্জাতিক সমস্যা প্রথমত ও প্রধানত মহাপ্রাচ্যের সমস্যা সম্পর্কে আমরা একযোগে কাজ করছি। ইরাকের সঙ্গে আমরা যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার হুক্তি সম্পাদন করেছি—এর উপরে আমাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত—সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-বিকাশ। আলজেরিয়া ও দক্ষিণ

লিবিয়া সম্পর্ক বন্ধন গড়ে তোলার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্যালেস্টাইন স্থিতি সংস্থার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সংযোগ দৃঢ়তর হয়েছে। হালে কিছু কিছু শক্তি সোভিয়েত-মিশরী সম্পর্কে ক্ষুর করার জন্য একটানা চেষ্টা করে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা এই বলতে পারি যে, আমরা এট সম্পর্ক দৃঢ়তর করার মৌল কর্তব্যরার প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছি। এ প্রতিফলিত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মিশরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তির মধ্যে, এই চুক্তিকে আমরা শুধু আমাদের দুটি দেশের নয় পরন্তু গোটা আরব দুনিয়ারও স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কের দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তি বলে গণ্য করি।

এই বছরগুলিতে ইজরারেলী আগ্রাসনের ফল-পরিণাম দূর করার জন্য আরব আভিগুলির সংগ্রামকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সুসঙ্গতভাবে সমর্থন করেছে। আমাদের দেশ আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধ দেশগুলির, অর্থাৎ মিশর, সিরিয়া ও ইরাকের সামরিক নিহিত শক্তি গড়ে তোলার সাহায্য করেছে—এবং ১৯৫৩ সনের অক্টোবরের যুদ্ধ দেখিয়েছিল এই সাহায্য কিরূপ কার্যকরী। আমরা রাষ্ট্রসংঘের ভেতরে ও বাইরে আরব রাজনৈতিক সংগ্রামকে সমর্থন করেছি।

মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে কোন যুদ্ধ নেই। কিন্তু শান্তিও নেই, প্রশান্ত অবস্থা তো দূরের কথা। আর যুদ্ধবিগ্রহ নতুন করে বেধে যাবে না একরূপ গ্যারান্টি দেবে কে? যতদিন পর্যন্ত ইজরারেলী সেনাবাহিনী অধিকৃত ভূখণ্ডে থাকছে এই বিপদ ততদিন থেকেই যাবে। এই বিপদ থেকেই যাবে যতদিন পর্যন্ত দেশ থেকে বিভাজিত লক্ষ লক্ষ প্যালেস্টাইনবাসী তাঁদের স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবেন এবং শোচনীয় অবস্থার মধ্যে বাস করবেন, এবং যতদিন প্যালেস্টাইনের আরব জনগণকে তাঁদের আত্মীয় রাষ্ট্র গড়ার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তিকে স্থায়ী করতে হলে এই অঞ্চলের সবগুলি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, তাঁদের স্বাধীন অস্তিত্ব ও বিকাশের অধিকারকেও অতি অবশ্য নিশ্চিত দিতে হবে। অহংবাদী লক্ষ্য অনুসরণ করে যারা মধ্যপ্রাচ্যে মীমাংসাকে রাজনৈতিক কলাকৌশলের লক্ষ্যবস্তুর করে তুলেছে এবং প্রকৃত সমাধানে বিলম্ব ঘটাবার জন্য, কিংবা এমনকি একরূপ সমাধানকে সংশয়ের বিষয় হিসাবে উপস্থিত করার জন্য পৃথক ভাষিক চুক্তিগুলিকে ব্যবহার করছে তারা কিরূপ গুরুতর এক দায়িত্ব নিয়ে তা কি পরিহার নয়?

ভিত্তিক। জেনেভা সম্মেলনের যুগ্ম-সভাপতি হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধের কার্যকরী মীমাংসায় পৌঁছবার সকল চেষ্টায় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আমরা রাষ্ট্রসংঘের কাঠামোর মধ্যে কিংবা অপর কোন ভিত্তিতে মধ্য-প্রাচ্যের সবগুলি দেশের নিরাপত্তা ও সীমান্তের অলঙ্ঘনীয়তার আন্তর্জাতিক নিশ্চিতদানে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত। যেহেতু এই বিষয়টিতে আমরা রয়েছেি কাজেই আমাদের অভিমত হল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি ব্রিটেন এবং ফ্রান্সও একত্র নিশ্চিতদানে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এতে ব্যাপারটির উপকারই হবে।

আমরা মধ্যপ্রাচ্যের সবগুলি দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বিকাশের পথ সুগম করার অবস্থা সৃষ্টির সপক্ষে। এদের কারুর বিরুদ্ধে আমাদের কোনরূপ কুসংজ্ঞার নেই। সবশেষে, আমরা এই অঞ্চলে অল্প প্রতियোগিতার অবসানের দ্বারা একটি সমস্যার সমাধানের সন্ধানও অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু মুক্তি-যুদ্ধভাবের এটিকে মধ্যপ্রাচ্যে একটা সামূহিক মীমাংসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে হবে। এক্ষণে একটি মীমাংসায় পৌঁছবার আগে সমস্যাটির মোকাবিলা করার চেষ্টার অর্থ হবে আগ্রাসনকারীকে আগ্রাসনের শিকারদের সঙ্গে সমস্তরে রেখে দেওয়া।

আলোচ্য কালপর্বে কেন্দ্রীয় কমিটি এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে স্বাভাবিক, যেখানেই সম্ভব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিকশিত করার দিকে প্রভূত মনোযোগ দিয়েছে।

সর্বপ্রথম, ভারতের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা সম্পর্ক কয়েকটি কথা বলতে চাই। সেই মহান দেশটির সঙ্গে বন্ধুত্বকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিই। গত পাঁচ বছরে সোভিয়েত-ভারত সম্পর্ক এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছে। আমাদের হুটি দেশ শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। এবং এমনকি এই বন্ধু কালপর্বেই সুস্পষ্টভাবে আমাদের বিপক্ষীয় সম্পর্ক-বন্ধনের বিপুল গুরুত্বকে, দক্ষিণ এশিয়া ও সমগ্রভাবে মহাদেশে একটি স্থিতিশীলতা আনয়নকারী উপাদান হিসাবে এর ভূমিকাকে প্রদর্শন করেছে।

ভারত প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আমাদের অপরিবর্তনীয় কর্তব্য। সোভিয়েত জনগণ ভারতের শান্তিকামী পররাষ্ট্র নীতির এবং তার কঠিন সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে ভারতের প্রগতিকামী শক্তির সাহসিক চেষ্টার মর্যাদাধারণ করেন

এবং উপরন্তু, এই কর্মনীতি ও চেষ্টার সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। আমরা ভারতীয় জনগণের ও সরকারের এই চেষ্টার তাদের পরিপূর্ণ সাক্ষ্য কামনা করি।

ঘটনাবলী বেশিরেছে পশ্চিম এশিয়ার সমস্যাটি সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের সৃষ্টিভিত্তি সঠিক ছিল। আমরা ১৯৭১ সনে ভারত-পাক সম্প্রসারণের অবসানকে এবং তখন পৃথিবীর সেই অংশে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক অতিদ্রুত স্থাপিত করার উদ্দেশ্যে সফলকাম হয়েছিলাম। আমরা এ লক্ষ্য করে আনন্দিত যে, এই সন্দর্ভে গ্রীষ্মের অবদান রাখতে আমরা কিছুটা পরিমাণে সমর্থ হয়েছিলাম।

সাধারণভাবে এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে বলতে গিয়ে আমাদের সৃষ্টিভাবের আফগানিস্তানের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়; এই দেশটির সঙ্গে আমাদের প্রায় অর্ধশত বছরের প্রাচীন নিরপেক্ষতা ও পারস্পরিক অনাগ্রাসন চুক্তিটির মেয়াদ আমরা সম্প্রতি বাড়িয়েছি। তুরস্কের কথাও উল্লেখ করছি, এ দেশটির সঙ্গে সহযোগিতা ঘূষাত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক বিষয়গুলিতে প্রসারিত হচ্ছে।

এশিয়া মহাদেশে শান্তি ও নিরাপত্তা সংহত করার এবং তার সঙ্গে সেখানে সমানারিকার সম্প্রসারণ সহযোগিতা গড়ে তোলার পথ-সন্ধান সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সক্রিয় অংশগ্রহণ চালিয়ে যেতে চায়। ঐক্যবদ্ধ সংযোগের মাধ্যমে, আর সেই সঙ্গে বহুপাক্ষিক ভিত্তিতে আমরা এর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাব। এ ব্যাপারে আমরা বারংবার আমাদের অভিমত ব্যক্ত করেছি এবং এশিয়ার স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার আগ্রহসম্পন্ন যে-কোন প্রস্তাবই যে আমরা চূড়ান্ত মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করতে প্রস্তুত, আর যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার সাহায্যে যে সেগুলি সম্পর্কে নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে প্রস্তুত, সে কথা জোর দিয়েই বলছি।

আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বহুদ্রুত সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারেও অনেক কিছু করা হয়েছে। সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে এই মহাদেশটিতে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতনের শেষ অঙ্ক প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। গিনি-বিসাউ ও ক্যেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জের, মোজাম্বিক ও আঙ্গোলার জনগণের বিজয় অর্জনকে সোভিয়েত কমিউনিস্টরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছেন; তাদের বহু বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় মুকুট হল এই দাফলা। সোভিয়েত

ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এই সব দেশের জনসমষ্টির শক্ত অবলম্বন করেছে এবং মুক্তরত দেশপ্রেমিকদের প্রতি সম্ভাষণা সর্বপ্রকার সমর্থন প্রদান করেছে। আর আজ আমরা এ জগৎ ধূলী যে, এই সব দেশের সঙ্গে আমাদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও আন্তরিক বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক উপলব্ধির মনোভাবে উৎকৃষ্ট।

আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুদের সঙ্গে, যেমন গিনি প্রজাতন্ত্র এবং কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। সোমালি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার এক চুক্তির মাধ্যমে দিয়ে আরো নির্ভরযোগ্যভাবে সুদৃঢ় হয়েছে। আর আফ্রিকার অগ্রতম বৃহত্তম দেশ নাইজেরিয়ার সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক আরো প্রসার লাভ করেছে।

যারা সত্যিসত্যিই বন্ধুত্ব চায় তাদের সঙ্গে যে সম্পর্কের প্রসার ঘটানোর ও তা শক্তিশালী করার জন্য আমরা সবকিছুই করছি এবং করে যাব। ঔপনিবেশিক ধ্বংসাবশেষের উপর যে বিপুলসংখ্যক রাষ্ট্র মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, শান্তি ও স্বাধীনতার প্রীতি তাদের ও আমাদের সাধারণ গভীর আশুগতা, আক্রমণ ও আবির্ভাবের সমস্ত ধরনের বিরুদ্ধে, এবং এক দেশ অন্য দেশকে শোষণ করার বিরুদ্ধে আমাদের উভয়ের গভীর ঘৃণাই আমাদের মৈত্রীর সঙ্গে একত্রে সামিল করেছে। মূল আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলির এই অভিন্নতাই হচ্ছে সেই সমৃদ্ধ ও ফলপ্রসূ ভিত্তিভূমি যার উপর আমাদের বন্ধুত্ব বেড়ে যেতে এবং প্রসারিত হয়ে যেতে থাকবে।

( এল. আই. ব্রেন্ডেনভের মূল রিপোর্ট থেকে )

## বাংলা থিয়েটারে উল্টো হাওয়া

দিগন্ত চক্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চল্লিশের দশকের গোড়ায় বাংলা নাট্যজগতে এসেছিল নবতরঙ্গ যা থেকে জন্ম নেয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। সেই চেতনায় ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বোধ। ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতাই ছিল তার মূল প্রেরণা। মুক্ত, ত্রুটিমুক্ত, কালোবাজার, আকর্ষক প্রযাশ্রী, বৃত্তি, মান্দ্রদায়িক দাঙ্গা ও অবশেষে দেশ বিভাগ জনজীবনের ওপর যে দূর্ব্বহ চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং সমাজের ভিত্তি ধরে টান দিতেছিল তা দেখে তখন সমাজ-সচেতন ও মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীরা স্থির থাকতে পারেন নি। ঔপনিবেশিক শাসন যে সমাজের নীচের তলাটাকে কতটা দূর্ব্বল ও অসহ্য করে রেখেছিল তার দৃষ্টান্তস্বরূপ চিত্রে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল পলাশের ময়ূরুর ত্রিশ লক্ষ অসহ্য মানুষের কীটপতলের মতো অনাহারে মৃত্যুতে। মানবতার সেই দারুণ বিপর্যয় দেখে লেখক-শিল্পীরা তখন সংঘবদ্ধভাবেই নেমেছিলেন তাঁদের গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, সংগীতে, নৃত্যে জনজীবনে এক নতুন মূল্যবোধ সঞ্চারের মহান ত্রুটি নিয়ে। উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী ছাড়িয়ে শিল্পকৃষ্টি পেল সমাজের নীচের তলার দিকে—জমজীবী মানুষের জীবন হলো উপজীব্য। কেবল ত্রুটি জীবনের ক্রান্তিকর কল্পণ চিত্রে অন্তর্লই নয়, জীবনপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামী উদ্দীপন সৃষ্টিই হলো সেই গণসুখী শিল্পের প্রধান লক্ষ্য।

কলকাতার ব্যবসায়িক থিয়েটারগুলি তখন পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ও রোমাঞ্চন করেই দ্রব্যকআউটের অন্ধকারে ধুঁকছিল ও টিকে থাকার জগ্রে আশ্রয় চেষ্টা করছিল। জাতীয় জীবনের কোন বিপর্যয়ই তাদের মানসিকতাকে আঘাত দিতে পারে নি। তাই নতুন থিয়েটারের জন্ম ও বিকাশ হয়েছিল ব্যবসায়িক থিয়েটারের বাইরে। সে তাঁর মঞ্চ বেছে নিল জনতার মধ্যে। জনজীবনের সঙ্গে হলো এট নতুন থিয়েটারের প্রত্যক্ষ সংযোগ। চললো জীবন থেকে নিয়ে জীবনকে দেবার পালা—শিল্পের সঙ্গে জীবনের হলো রাশীযন্ত্রন।

সময় নেতৃত্ব ও আশ্রয় জগতের গণনাট্য সংঘের মতোই সীমাবদ্ধ থাকল না।

তার বাইরেও সেই তরঙ্গেই অভিযাত ঘটলো। শিল্পের একই আদর্শ নিয়ে চারপাশে গড়ে উঠল আরও অনেকগুলি গোষ্ঠী থিয়েটার (Group Theatre)। এই সামগ্রিকতাকে নিয়েই তখনকার বাংলা থিয়েটারের নয়া তরঙ্গ। নতুন সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হলো বাংলা থিয়েটারের ঐতিহ্য—এলেন রামনারায়ণ, মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি জনতার মঞ্চে। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরে উঠল বাংলার নাট্য আন্দোলন। ব্যবসায়িক থিয়েটারগুলিও এখন এই ধারাকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত করে বিশরূপে দিকে ঘাবাব কণা ভাবতে পারে নি। নতুন ধারাকে চ্যালেঞ্জ না করে তারা বরং এর সঙ্গে একটা সমঝোতা বা compromise করে চলারই চেষ্টা করে। নাট্যাচার্য শিশির-কুমার ভাষাভাষী তাঁর শ্রীরঙ্গম থিয়েটারে তুলসী লাহিড়ীর “দুঃখীর ইমান” নাটক প্রযোজনা করে এই নব নাট্যধারাকে খানিকটা স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন। অন্যান্য ব্যবসায়িক থিয়েটারও তখন মোটামুটি সামাজিক সমস্যামূলক নাটকই মঞ্চস্থ করত। মঞ্চে কুচিচিপূর্ণ জলাঞ্জলি দৃষ্টের আমদানী করে দর্শক টানবার চেষ্টা কেউ করত না বা তা করার সাহসও পেত না। গণনাট্যকেন্দ্রিক নব নাট্যধারা দর্শককর্মে অনেকটা মার্জিত করে এনেছিল।

দুটি দশক এভাবেই চলছিল। কিন্তু এর মধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। ব্যবসায়িক থিয়েটারে এখন উন্টো হাওয়া বহছে। বিস্তর পীক চুকেছে সেখানে। দর্শকের আদিম জৈব প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জগ্রে যৌন আবেদনকে পুঁজি করে পসার জমাবার প্রবল প্রতিযোগিতা চলেছে সেখানে। ক্যাবারে নর্তকীদের মঞ্চে এনে প্রায় নগ্নাবস্থায় এমনভাবে নৃত্য করানো হয় যা দেখে কোন ক্রটিশীল দর্শকের লজ্জায় অধোবদন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। পরপর ‘চোরঙ্গী’, ‘আসামী হাজির’, ‘পরঙ্গী’ নাটকে ক্যাবারে নাচ আমদানি করে যে বেলেচাপনার আসর জমানো হয় সেটাই আজ অন্যান্য থিয়েটারকেও সংক্রামক রোগের মতো আক্রমণ করছে। নাবালক শ্রুতকন্ডা তো পূরের কথা, সাবালক-সাবালিকা পরিজন নিয়ে একসঙ্গে এদর থিয়েটারে নাটক দেখতে গেলে লজ্জায় পরস্পরের দিকে তাকানো কঠিন হয়ে পড়ে—নাটক দেখে বেরিয়ে আসার পরে ঘুব বন্ধ করে বাড়ি ফেরা ছাড়া উপায় থাকে না। এমন কি স্বামী-স্ত্রী দেখতে গেলেও স্বীচের সামান্য লালীনতা বোধ আছে, এই কদম্বতা দেখে তাঁদের অবরোধ বিরক্তিতে কিঞ্চিত বন্ধ না হয়ে যায় না। এককথায় নাটকি কারের অস্বীকার্য এসে চাকচাক থিয়েটারে।

ক্যাথারে নাচ না নাচিয়েও নাটকে যৌন আবেদন জানা হচ্ছে নানা কৌশলে। বিজ্ঞাপনে ভালোবাসার Blow Hot প্রচার করে এমন একটি নাটকের অভিনয় 'ক' বছর ধরে চলছে যাতে রব্বিছে মানুষের কুপ্রভৃতিকে সুড়গুড়ি দেবার সম্ভাবনা প্রয়াস। বিজ্ঞাপনে ঘটা করে বলা হয়—প্রতিটি দৃশ্যই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। অর্থাৎ নিষিদ্ধ কল ভঙ্গনের প্রলোভন যেন কিশোর-কিশোরীর মনেও জাগে। 'বাবর' ও 'প্রজাপতি' উপন্যাস দুটির শালীনতা নিয়ে দাক্ষ প্রদত্ত গঠে। শেষোক্ত উপন্যাসটির অঙ্গীলতার বিরুদ্ধে যামলা লাহের হলে আশালতের বিচারে লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরের দণ্ডও হয়। কিন্তু সে দুটি উপন্যাসেরই নাট্যরূপ দিবে দুটি ব্যবসায়িক থিয়েটারে নিরর্থিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। নাটকে অঙ্গীলতার অংশ যথাসম্ভব বর্জন করলেও উদ্দেশ্য এক—যে উপন্যাসের বিরুদ্ধে অঙ্গীলতার অভিযোগ উঠেছে তারই নাট্যরূপ দেখার জগ্রে আদ্যম জৈব প্রবৃত্তির কাছে আবেদন। 'প্রজাপতি' ছেড়ে এখন 'ব্যাডচার' এ প্রবেশ। নাটকের বিজ্ঞাপন 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' এতেও সেই স্বল্পবাস পরিহিত্য ক্যাথারে নর্তকীর রিপু-উদ্দেশ্যক নৃত্য। কোন কোন অপেলানার নাটা শোজির মধ্যেও এই প্রবণতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের সংখ্যাও বেড়েছে। এ ধরনের নাটক বেখে দেখে তার একটা বড়ো অংশেরই ক্রটি বিকৃত ও নিয়মায়ী হয়েছে। তারা এ ধরনের নাটকই খোঁজে। দর্শকসংখ্যা বাড়ার থিয়েটার ব্যবসা এখন জমজমাট। কাজেই এ ধরনের ব্যবসায়িক থিয়েটারের জগ্রে বর্তমানে পুঁজির অভাব হচ্ছে না। তাই প্রেক্ষালয়ের সংখ্যাও বাড়ছে। বাড়লেও ক্যাথারে-ওয়ালাদের বিরুদ্ধে এমন কোন ব্যবসায়িক থিয়েটার নেই যেখানে জীবন-বোধের গভীরতাসম্পন্ন ব্যবসায়িক নাট্য প্রযোজনার দ্বারা এই কুক্রটিপূর্ণ থিয়েটারের নগ্নতার প্রতিবাদ হতে পারে। অঙ্গীলতা যাদের কটিতে বাধে তারা হয় সামাজিক নাটকে গভ্যনুগতিক ট্যাডিশনপন্থী, নয়তো ঐতিহাসিক নাটকের নামে শ্রুতলাই মননদগায়ী। সমকালীন রাজনৈতিক বা জগনৈতিক সমস্যা তো দূরের কথা বর্তমান সামাজিক জটিল সমস্যাও কলকাতার ব্যবসায়িক থিয়েটার থেকে কেঁটিয়ে বিবেচ করা হয়েছে। সামাজিক নাটক বলে খেঙোলা চালানো হচ্ছে সেগুলোতে আছে নেতিবাচক দুগুণরা অবক্ষয়ের চিন্তা। এরা এই অবক্ষয়ই নির্দিষ্টকালীন এ প্রেক্ষায়িত্যে (এই ধরনের সমস্যা সমাধানের

নেই—মানুষের হাত-পা নাগশাশে বাঁধা—এ অবস্থা অপরিবর্তনীয়, অলঙ্ঘ্য। পশ্চিলাবর্তে হাবুডুদু খেতে নিঃশেষ হয়ে যাওয়াই যেন অর্থাভাব।

এসব থিয়েটারে খুঁজি ঢালবার জন্তে যে জেগারী ধনপতিরা এগিয়ে এসেছে তাদের অনেকই লোহালকরের কালোবাজার ক'রে বা মুদ্রাস্ফীতির সুযোগে অল্প টপায়ে প্রচুর টাকার মালিক হয়েছে। তাদের কোন সামাজিক দায়বোধ নেই। কুচি তো নেই-ই। অল্প ব্যবসার বুদ্ধি নিয়েই তারা এসেছে মুনাফা করার জন্তে থিয়েটারে টাকা ঢালতে। আটের মূল্য তাদের কাছে আর দশটা বাজারী পণ্যের চেয়ে বেশি নয়। নয় নারীদেহ দেখলে যদি পরসী আসে তবে তেমন সুযোগই বা তারা ছাড়বে কেন! প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনে একদা যাঁরা কৃতী শিল্পী ছিলেন তাঁদের অনেককেই এরা টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে। জীবনবাদী শিল্পদর্শকে শিকের তুলে রেখে জীবিকাভোগের অজুহাতে তাঁরা জীবনবিমুখ শিল্পের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

চল্লিশের দশকের আগে বঙ্গীয় থিয়েটারে বেলোড্রামা ছিল, স্ক্রলড ছিল, ছিল জীবন অন্বেষণের অভাব—কিন্তু জনকণ্ঠকে বিকৃত করে অধোগতির দিকে ঠেলবার জগে আজকের মতো তখনকার দিনের থিয়েটারে ছিল না এমন কদর্য প্রথা। প্রথম মহামুন্ডের পরে লোহালকরের ব্যবসারে ফেঁপে ওঠা লোকদের হাতে পড়ে ইংলণ্ডে ওয়েস্ট এণ্ড পাবলিক থিয়েটারগুলিরও এমন অধঃপতনই হয়েছিল।

বাংলাদেশের যাত্রা একটি পরম্পরাগত লোকনাট্য ধারা। শহর থেকে গ্রাম বাংলা পর্যন্ত এর বিস্তার এবং যাত্রা পাণ্ডুর দর্শক লক্ষ লক্ষ। এসবের দিক দিয়ে ও দর্শক সংখ্যার বিচারে মক্কাটক এর-বারেকাছেও পৌঁছাতে পারে না। থিয়েটারের মতো যাত্রারও আপেক্ষিক বিস্তার বেড়েছে। যাত্রাকে এখন অনেকটা থিয়েটারী চং-এ আনা হয়েছে। বিষয়বস্তুর পরিবর্তনও লক্ষ্যণীয়। পৌরাণিক ও কাহিনিক কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যাত্রা বর্তমানে সমকাল ও ইতিহাসমুখী হবার দিকে। অতি অধুনা হিটলার, রামমোহন, নেপোলিওঁ, জেনিন, বিজ্ঞানাগর, নটি বিনোদিনী প্রভৃতি জীবনীমূলক পালা যাত্রার আসরে এসেছে। জবার শ্বেতাঙ্গদের নির্যাদাঘটন এবং স্কাটল্যান্ড অবলম্বনে ক্রীড়াদাস পালাও যাত্রাঙ্গণতে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু এটাই যাত্রাঙ্গণতের পূর্ণ চিত্র নয়। থিয়েটারের প'ক সেখানেও প্রবেশ করেছে আর শহর ছাড়িয়ে তা স্পর্শ করেছে গ্রামের অজস্র নিরক্ষর দর্শকশ্রেণীকেও।

পত্রাধিক যাত্রা পালায় রচয়িতা ত্রজেন দে আখ্যা পেরেছিলেন ‘পালা সন্ধ্যা’। সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন। প্রায় চারটি দশক যাত্রাঙ্গণের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সুতরাং তার অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর।

যাত্রাজগতে নোঁংরাযি প্রত্যয় দেখে ব্যথিত চিত্তে ফুটার কিছুদিন পূর্বে যে কথাগুলি তিনি বলে গেছেন তা লক্ষ্যীয়।

একটি সাময়িক পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন : “বলতে আমার লজ্জার মাথা নুড়ে আসে। এখনকার যাত্রা হচ্ছে খিস্তিখেউড় আর নহনুঙোর আখড়া। মহানন্দে নাট্যকার পোশাক আসরেই বোল-সত্তের বার খোলা হচ্ছে। নাট্যকার সহজে পালাকার লিখছেন—‘যথা সম্ভব স্বল্পবাস’। বিজ্ঞাপন পড়ছে—‘আসরে স্বর্ণ, আলো-অ’ধারিতে পোশাক পাল্টানো’। কিছু কিছু পালায় আবার বিপ্লবী (!) চরিত্র এসে একগাথা খিস্তি দিচ্ছে, যার মধ্যে ‘শু’তোরের বাচ্চা’ উল্লন খানেক। আমাদের কর্তব্য যে লোকশিক্ষা তা ভুলে গেছেন এইসব পালাকার, প্রযোজক এবং শিল্পীরা।”

ত্রজেনবাবুর এই বেদনাভরা খেদোক্তি একটি সং মনের অভিব্যক্তি। যাকে গণ বলা হয়, যাত্রার প্রধান আবেদন সেই সরলমতি গ্রাম্য গণসমষ্টির কাছে। যাত্রার আসরে সরলপ্রাণ তরলমতি বালক-বালিকা কিশোর-কিশোরীরা এসেও পালা দেখে। লোকনাট্যের ধ্বজা তুলে সেই কচি মনগুলিকে কিভাবে বিধিয়ে দেওয়া হয়, ত্রজেনবাবুর মগবাই তার অকাটা প্রমাণ। বলা বাহুল্য, গ্রামের ধনী কৃষক পরিবারের উঠতি ছেলেরাই এসব যাত্রাপালায় প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

এ থেকেই বোঝা যায় জনহৃদিকে বিকৃত করার এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্তে আজ শূন্য জীবনবোধমন্সল নাট্য আন্দোলনের কত বেশি প্রয়োজন। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া তা সম্ভব নয়। চরিত্রের দশকে যে সংঘবদ্ধতা গণনাট্য আন্দোলনকে জন্ম দিয়েছিল, যে দারবোথ থেকে শিল্পের লক্ষ্য স্থির করে তারা এক হতে পেরেছিল, আজ তার অভাব। পশ্চিমবঙ্গে প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলন আজ ছত্রভঙ্গ, লতনা বিচ্ছিন্ন। সি সি এম-এর সংকীর্ণ বামপন্থী রাজনীতির কবলে গিয়ে রাজ্যের গণনাট্য সংঘ মৃতপ্রায়। ক’বছর আগে ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ নামে একটি সংগঠন গড়া হয় : কিন্তু যে কারণেই হোক নানা ব’ধে নি তা বিকলভাবে এখানে সেখানে কিছুটা কাজ চলেও সংহতির অভাবে সেটা সংগঠিত আন্দোলনের রূপ নেয় নি। সেটি

থিয়েটার গ্ৰুপ (Group Theatres) একটি থেকে আর একটি বিচ্ছিন্ন। তাদের কোন সংঘবদ্ধ উদ্যোগ নেই। কলে একে একে নিভিছে পেটটি। অনেকগুলির অশুভ লোশ পেয়েছে। দেশব দলের প্রধানরা এখন যাত্রা, টেলিভিশন অথবা হুঁশ কমাণিফাল থিয়েটারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বা আশ্রয় খুঁজছেন। যে ক'টি গ্রুপ থিয়েটার টিকে আছে তারা করছে অস্তিত্বের লড়াই। শব্দ মিত্র স্বাপিত 'বহুক্রপীর' দম অনেকটা ফুরিয়ে এসেছে। প্রতিকূলতার চাপে 'নবান্ন' লেখক বিজয় ভট্টাচার্য নাট্যপ্রযোজনায় এখন প্রায় নিষ্ক্রিয়। 'নান্দীকার' গোষ্ঠী উদ্বাস্ত। 'রূপকার' কণীগ্রাণ। 'গন্ধর্ভ', 'নক্ষত্র', 'নাটমহল', 'অভূদয়' এবং এ ধরনের আরো অনেক গ্রুপ থিয়েটারকে পাততাড়ি গুটাতে হয়েছে। যারা টিকে আছে তাদের কোন নিজস্ব প্রেক্ষালয় নেই। এখানে সেখানে সৈনিক মোটা অস্ত্রের হলভাড়া দিয়ে তাদের অস্তিত্ব করতে হয়। তার মক্কেল টিকিটের নাম চড়া করা ছাড়া উপায় নেই। সেই চড়া নামের টিকিট কেটে স্বল্প আয়ের সাধারণ দর্শকদের প্রেক্ষালয়ে প্রবেশ সাধ্যাতীত। গরীবের থিয়েটার একটিও নেই।

প্রগতিশীলতার ধ্রুপদ তুলে নাটকের জগতে জল খোলা করার প্রয়াসও কম নয়। 'অঙ্গার', 'কল্লোল', 'ফেরারী ফেঁস' এর নাট্যকার উৎপল বসু এখন অতি-বিপ্রবী সঙ্গে প্রতিবিম্ব ছড়াতে বাস্তব তাঁর 'ব্যারিকেড' নাটকে বলি হয়েছে। এদেশে 'চলেছে এখন ফ্যাসিস্ত শাসন আর গোটা ভারতবর্ষ একটা কন্সেনস্ট্রেশন ক্যাম্প বা বন্দী লিবিরে পরিণত—যদিও কৌশলে নাটকে তিনি ব্যবহার করেছেন হিটলার কবলিত আর্ম্যানীর পটভূমি। তাঁর 'স্বঃপ্রের নগরী' নাটকেও প্রায় একই প্রতিবাগ্য বিষয়। সম্প্রতি তাঁর 'লেনিন কোথায়' নাটকে লেনিনের নাম করে যে বিকৃত-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তিনি তা অমার্জনীয় অপরাধ বলেই মনে হয়। তাঁর মতে হিন্দুরা সরকার কেবেরনিক্স বুর্জোয়া সরকারের সমতুল। সি পি আই-এর ভূমিকা সেখানে মেন-শেভিকদের মতো। রূপ পটভূমিতে রচিত হলোও উৎপলবাসু তাঁর এই নাটকে তাঁর ছুঁড়েছেন যে কোনদিকে লক্ষ্য রেখে তা বুঝবার জন্ত অতি মনস্তত্ত্ব দর্শকের প্রয়োজন হয় না—ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কেউ একেবারে নির্বোধ না হলেই তার নজরে পড়বে তা। উৎপল বসুর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সি পি আই; কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের 'কেবেরনিক্স' সরকারকে মদত দিচ্ছে আর ভারতীয় 'মেনশেভিক' পার্টি সি পি আই-কে সমর্থন করছে। এই প্রেরণা

আসছে কোন মহল থেকে আর বিপ্লবী সাইনবোর্ড টাঙিয়ে তার আড়ালে কোন ডেজাল চালানো হচ্ছে তা অনুমান করা যার সহজই। বিপ্লবের নামে এই ডেজাল চালিয়েই উৎপলবাবু বাজার পরম করে রেখেছেন। তিনি বলশেভিক বিপ্লবের পটভূমিতে ভারতের বর্তমান অবস্থা দেখাতে গিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি বলশেভিক বিপ্লবের স্তরে? আন্তর্জাতিক দিকটাই তিনি কোঁসলে এড়িয়ে গেছেন। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরেও কেরেনস্কি সরকার 'পবিত্র মৈত্রী চুক্তির' অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অংশীদাররূপে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী ছিল অর্থাৎ জারশাসনের পররাষ্ট্র নীতিই অনুসরণ। যুদ্ধে রাশিয়ার জন-জীবন কতটা বিধ্বস্ত হয়েছিল আর দেশের সর্বসাধারণ এবং সেনাবাহিনীর একাংশে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ও শান্তির জগ্রে আগ্রহ কতখানি তীব্র হয়ে উঠেছিল, উৎপলবাবুর কি তা জানা নেই? না, জেনেও তিনি তা এড়িয়ে গেছেন? তাই লেনিনের কর্মসূচীতে শান্তি ছিল একটা প্রধান দফা। পররাষ্ট্রনীতিতে বর্তমান ইন্দিয়া সরকারের ভূমিকা কি কেরেনস্কি সরকারের অনুরূপ? এ সরকার কি সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতায় পক্ষাংগ? মুক্তিসংগ্রাম দমনে বা কোন যুদ্ধ দেশের স্বাধীনতা হরণের অভিপ্রায়ে সাম্রাজ্যবাদীরা এখন সশস্ত্র সংঘাত ঘটায় তখন কি ইন্দিয়া সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে দাঁড়ায়, না মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করেন? ভারত সরকার কি বারবার যুদ্ধের বিতর্কে ও শান্তির পক্ষে ঘোষণা করছেন না আর পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ভেতন অবস্থানই নিচ্ছেন না? উৎপলবাবু সশস্ত্র বিপ্লবের যত কীকা বুলি আওড়ান না কেন, তার দ্বারা বাস্তব সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না; রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ ও অর্বাচীন কিছু দর্শককে সুড়ঙ্গি নিয়ে হাণানো যায় ও বাহবা মেলে।

বাজু রাষ্ট্রাভ্যুত্থান, ভূমিসংস্কার, সরকারী শিল্পপ্রকল্প প্রভৃতিকে উৎপল-বাবু বোধ হয় তাঁর বিপ্লবে প্রতিকূল মনে করেন; তাই তিনি সেগুলোকে বাজু করেছেন। যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে আহ্বান্যে না পাঠিয়ে তাঁর প্রতি নেই সেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রই কিন্তু একরূপ বাজু করতে বা প্রগলভতা দেখাতে পারছেন তিনি। লেনিনের নাম করে তিনি ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীকে যেভাবে হেয় করার স্পর্ধা দেখিয়েছেন তার দ্বারা কেবল ভারতের জনগণেরই অবমাননা করা হয় নি, লেনিনের দেশ আর তাঁর নীতিকেও অসম্মান করা হয়েছে।

অষ্টোবর বিপ্লবকে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে এনে দাঁড় করাবার চেষ্টা

ইতিহাসেরই বিকৃতি। উৎপলবাবু তো রেবট-এর একজন ভক্ত। রেবট-ত্রিশের দশকের গোড়ায় গোবিন্দ 'মাদার' উপন্যাসকে তখনকার জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিতে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় রূপ শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিতেই তিনি পুনরায় 'মাদার' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন এবং পূর্ব ভুল স্বীকার করে বলেন—এ ধরনের এক একটা বিশেষ ঐতিহাসিক অধ্যায়কে অঙ্গ দেশের পটভূমিতে টেনে আনলে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে। তা করা শিল্পসম্মত কাজ নয়।

উৎপলবাবু তাঁর 'লেনিন কোথায়' নাটকে এই অপরাধই করেছেন। কেরেনস্কি সরকারের অপদার্থতা ও মহান অক্টোবর বিপ্লব ইতিহাসসম্মতভাবে দেখালে তিনি একটি সংশ্লিষ্ট দেখাতে পারতেন। তার দাবী কি নাটকের বৈশ্বিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে দর্শকদের অসুবিধে হতো? কিন্তু উৎপলবাবুর উদ্দেশ্য তো তা নয়। তিনি চান বিপ্লব আমদানি করতে। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন না করে তাঁর মনগড়া হস্তান্তর এনে নাটকে মেলা অজ্ঞান সৃষ্টি করেছেন তিনি। তাই 'আলিবাবা' নাটকের মজিনার সেই গানের লাইনই মনে পড়ে—“ছি ছি এস্তা অজ্ঞান।”

প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার আর একটি কৌশল আধুনিকতার নামে পশ্চিম ভূমির অবক্ষয়ী বুর্জোয়া চিন্তাগুলির আমদানি। বাদল সরকারকে মধ্যমণি করে কোন কোন গোষ্ঠী উক্ত নাট্যের (Theatre of Absurd) নামে মানুষের মধ্যে প্রচার করছে জীবনের পুনরাবৃত্তি, লক্ষ্যহীন পথযাত্রা, একঘেয়ে জীবনের অবসাদ ও ক্রান্তি—যেন এটাই মানব জীবনের শাস্ত্র সত্য—পরিবর্তনের যৌথ প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য ব্যক্তি ও অমোঘ সামাজিক বিধানের বশে। তার অর্থ যেখানে আছে সেখানেই থাকে। আর তারই মধ্যে ঘুরপাক খাও—এ থেকে নিষ্কৃতি নেই; অতএব নিষ্কৃতির পথও খুঁজো না। মেকী আধুনিকতার জৌলসে মোড়া এমন জীবনবিষ্ময়খণ্ডও আকাশের পুরস্কার পেয়ে দরবারে পর্যন্ত মর্যাদা পেয়েছে!

এর বিপরীতে সাম্রাজ্যবাদ ও ঐতিহ্যবিরোধী এবং সুস্থ সামাজিক বোধ-সম্পন্ন নাটকও যে কোন কোন দল প্রয়োজনা না করছে এমন নয়। কিন্তু তা সংখ্যায় এতই বিরল যে তাকে ব্যতিক্রম বা অপ্রধান না বলে উপায় নেই। ব্যবসায়িক থিয়েটারের কুক্রটি আর তথাকথিত অবাবদায়ীদের বিকৃতির ষোড়-ফলই প্রধান হতে উঠেছে। গণ-সংযোগের খানিকটা চেঁকা বরং দেখা যায়

একাত্ত নাট্যপ্রযোজক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে। তাঁদের গণ-সংযোগের মত প্রধানত একাত্ত নাট্যপ্রতিযোগিতার আদর। ভ্রমিক, কৃষক পর্যন্ত পৌঁছাবার দৌড় তাঁদের নেই; তবে স্বল্পবিত্ত নিম্ন মধ্যশ্রেণীর দর্শক তাঁরা পান।

একাত্ত নাট্যের ক্ষেত্রেও চিত্রার প্রচুর অটিলতা, অস্বচ্ছতা ও অবিরোধিতা রয়েছে। এক্টারিশমেন্ট-বিরোধিতার নামে প্রগল্ভতাও প্রকাশ পায়।

কিন্তু বিপ্লবের নামে স্বকোপলকল্পিত ধারণাকেও সোজার কণ্ঠে প্রচার করা হয় যার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্কই নেই। শ্রেণী-সংগ্রামকে দেখা হয় অতিশয় সংকীর্ণ দৃষ্টিতে—বিপ্লবের চেয়ে অতি সরলীকরণের খোঁজই বেশি। এসব সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে বাংলা একাত্ত নাট্যে কিছুটা প্রাণস্পন্দন আছে।

জনতার খিঁচুটার ছেড়ে যাঁরা দরবারী খিঁচুটারে গিয়ে বাঁচবেন ভেবেছিলেন, কালো টাকার চাপে সেখান থেকেও তাঁদের বিদেশ নিতে হয়েছে। দরবারও গেল, জনতাও গেল। তাই এখন তাঁদের অস্তিত্ব নিয়ে কান্না। দরবারের মোহে যাঁরা আচ্ছন্ন হন নি বা ব্যবসায়িক খিঁচুটারের কুক্রটি ও স্বল্পভেদের কাছে নিজেদের বিবেক ও শিল্পচেতনাকে অর্পণের লোভে বিকিরে দেন নি, তাঁরা নিজেদের মতো করে আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করছেন। কিন্তু প্রতিকূল হাওয়া এতই প্রবল যে একক সংগ্রামের দ্বারা টিকে থাকা হ্রস্ব। এদিকে সংঘবদ্ধ কোন প্রয়াসও নেই। এই আত্মকেন্দ্রিকতা ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতার ফলে একদিকে যেমন ব্যবসায়িক খিঁচুটার মূলে ক্রমশ পুঞ্জীভূত হবার অনুকূল পরিবেশ পাচ্ছে, তেমনি অত্রনিকে প্রগতিশীল নাটকের মূলে রিস্ততার শূন্যত্বও উত্তরোত্তর বাড়ছে। চল্লিশের দশকের মতো একটা সম্মিলিত উদ্যোগ না নিলে এই শূন্যস্থান পূরণের আশা নেই। পশ্চিমবঙ্গের নাট্য আন্দোলন প্রতীক্ষার আছে তেমনি একটা বোধ বলিষ্ঠ উদ্যোগের বা গণনাট্যের মূল আদর্শকে ও লক্ষ্যকে সাহসে রেখে তার বর্তমান ক্ষীণভেদা ধারাটিতে করবে আবার নতুন শক্তির সঞ্চার আর আনবে নতুন প্রাণবন্ত্য।

## জার্মানীর কৃষক বিদ্রোহের নায়ক : টমাস মুয়েনৎসার

১৫২৫-এর ১৬ই মে, তাঁর যুত্যাগত কার্যকরী হওয়ার এগার দিন পূর্বে মুয়েনৎসার ঘোষণা করলেন “OMNIA SINT COMMUNIA !”—“সকল সম্পত্তিতে সকলের অধিকার !” ফ্রাঙ্কেনহেসেনের নগর সভাকক্ষের প্রকোষ্ঠে মানুসফিৎসের রাজ্যতান্ত্রিক অস্তিত্ববর্ণের উপস্থিতিতে তাঁর এই ঘোষণা সক্রিয়তার স্বপ্নায় নথীভুক্ত হলো। ১৫২৫-এর ২৭শে মে তিনি প্রাণ দিলেন তাদের তরবারির আঘাতে মুংলহেসেনের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্য—হুনিয়ার বুক থেকে তাঁর স্থিতি মুছে ফেলা। কিন্তু তিনি শক্তিতে রেখে গেলেন এমন এক আত্মিক শিখা যা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে আজও অনির্বাপ। সাধারণ মানুষকে উদ্বেগ করে তিনি যেভাবে বলেছিলেন তেমন করে আর কেউ বলেন নি। আগুন জ্বলে উঠল, শাসকবর্গের হাতের অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে উদ্ভত হলো সাধারণ মানুষ এবং সে অস্ত্র ধারণ করল তাদের বিরুদ্ধে যারা তাদের আবদ্ধ রেখেছিল দাসত্ব আর অজ্ঞতার।

“যেমন তাঁর ধর্ম-বর্ণন ছিল নিরীশ্বরবাদের সমীপবর্তী তেমনই তাঁর রাজননীতিগত কর্মসূচী উপনীত হয়েছিল সাম্যবাদের প্রান্তে।”—লিখেছিলেন ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস—সেই মানুষটি সম্পর্কে যিনি কৃষক অভ্যুত্থানের বৈপ্লবিক কড়ের ঘূষে মানব মহত্বের পতাকা বহন করেছিলেন এবং যিনি বিপ্লবের চিরায়ত প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।

হার্জ পর্বতমালায় পাদদেশে স্টোলবার্গের এক হাজক পরিবারে জন্ম টমাস মুয়েনৎসার। অচিরেই পিতার গ্রন্থশালার মাধ্যমে তিনি বুদ্ধিগত পরিণকতা লাভ করেন। লিপজিগে ও হডারের ভাৱে ক্রান্তফুটে তিনি অধ্যয়ন করেন ধর্মতত্ত্ব। গির্জায় নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারী, শিক্ষক, মুদ্রক এবং আরও অন্যান্য উপায়ে নানাভাবে বিভিন্নহানে অর্জন করেন জীবিকা। একজন প্রাজ্ঞব্যক্তিরূপে সীতাই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। ক্যাথলিক চার্চের তত্ত্বাব্ধি আর যেভাবে সাধারণ মানুষকে অন্ধ বানিয়ে রাখা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে তিনি দণ্ডায়মান হলেন। ১৫১০ সালে যখন তিনি সবে বিশ বছরে পদার্পণ করেছেন, তখন ম্যাগডিউবার্গের আর্চবিশপ দ্বিতীয় আর্নস্টের বিরুদ্ধে তিনি গড়ে তোলেন প্রতিবাদ।

## অভিজ্ঞাতবর্গকে তিরস্কার

রাজনীতিতে প্রাক্ত মুয়েনৎসার নীতিই নিজের কর্মসূচী দ্বারা করে ফেললেন। “ঐহিক শাসকবর্গের প্রতি অনুগত থাক”—এনি তুলে লুথার যখন পত্ৰাদেশাদেশ করতেন, তখন তিনি জিকার্ট, প্রাগ, অল্টস্টেড, মুহ্লহসেন, ব্র্যাক ক্রেস্ট, রাইনল্যান্ড এবং পুনরায় মুহ্লহসেনে প্রব্রুত বর্মোপদেশে, লুথারের সবচেয়ে অগ্রগামী চিন্তাধারাকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। চার্চ এবং রাষ্ট্র—এ দুয়েরই বিরুদ্ধে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের ক্ষেত্রে মুয়েনৎসার আক্রমণ চালান। জনসাধারণের বিচার প্রবণতার প্রতি আবেদন জানিয়ে তিনি যে কেবল তাদের ভাবাবেগকে গতিশীল করে তুলেছিলেন, তাই নয়, তাকে সক্রিয় করে তুলতে তিনি তাদের সংগঠিত করতেও আরম্ভ করেন, শুধু করেন সর্বত্র সকারমান অধিকণা সংগ্রহ করে দাবাধি জ্বালানোর আয়োজন। বিভিন্ন গীর্জার পাদপীঠ হতে ক্রমাগত ভাঙিত ও জীবিকা হতে পদচ্যুত হওয়ার পর তাঁর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হলো ম্যানসফিল্ড জেলার অল্টস্টেডে, ১৫২৪-এর মার্চ মাসে। এখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর গুপ্ত সমিতি যার সভ্যগণের মধ্যে ছিলেন কারিগর, কৃষক, ম্যানসফিল্ডের খনি-শ্রমিক এমন কি নগর-শিতারাও। মুয়েনৎসার তাঁদের লক্ষ্য নির্ধারণ করলেন : “*Omnia sint communia*” ! “সকল সম্পত্তিতে সকলের অধিকার।” এবং এর অর্থ পরিষদে (রাজসভায়) ও মঠে যারা তাঁদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব দাবী করে তাঁদের হাত থেকে তা উদ্ধার করতে হবে।

রাজসভাকে অব্যাহতি দেন নি মুয়েনৎসার। ১৫২৫-এর ১৭ই মার্চে রাজসভা বর্গের উদ্দেশ্যে প্রব্রুত তাঁর বিখ্যাত বর্মোপদেশে তিনি অভিজ্ঞাতবর্গকে জনগণের নিপীড়নকারী বলে তিরস্কার করেছেন। “মহাজনী কারবারের নির্গলিতার্থ হলো ভ্রষ্টবৃত্তি ও দম্ভাবৃত্তি, আর আমাদের ভ্রাম্যী ও রাজসভা বর্গ তাই করেন। তাঁরা সকলকে তাঁদের সম্পত্তি বলে বিবেচনা করেন। তাঁদের এহেন আচরণের দ্বারা ভ্রাম্যীবর্গ দরিদ্র মানুষকে তাঁদের লক্ষ্যে পরিণত করেছেন... এসব কথা বলেছি বলে আমাকে বিব্রোহী হতে হবে। উত্তম... শক্তি যোগাতে হবে সাধারণ মানুষকে।”

১৫২৪-এর এপ্রিল, মুক্তনগরী মুহ্লহসেনের সাধারণ মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠালাভ করল তাঁর বিপ্লবী চিন্তাদর্শ। কিন্তু নগর পরিষদ কর্তৃক তিনি সেখান থেকে বহিষ্কৃত হলেন। অতঃপর তিনি তাঁর ক্রমবর্ধমান উৎসাহী

সমর্থক-পরিবৃত্ত হয়ে দ্রুত দক্ষিণ আর্থানী পরিক্রমা যাত্রা তাঁর যতাবশর প্রচার করলেন। ১৫২৫-এর ফেব্রুয়ারীতে যখন তিনি মুহ্লহসেনে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন নগরের সেই সংখ্যাগরিষ্ঠেরা যারা ছিল নিঃসম্বল, তাঁকে আনাল বিজয়ীর অভিনন্দন। ( সেখানে ) পুরাতন নগর পরিষদের পতন ঘটিলে এক নতুন “চিরায়ত পরিষদ” প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করলেন মুয়েনৎসার। সে সময়কার রাজকীয় সম্বায় বর্ণিত এক প্রতিবেদন হতে জানতে পারা যায়, “এই পরিষদ গঠিত হয়েছিল নিঃসম্বল, দারিদ্র্য নিপীড়িত সেইসব জনগণের দ্বারা যাদের মধ্যে এমন কেউই ছিলেন না যিনি এমনকি ৩,০০০ গিণ্ডার মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী।”

মুয়েনৎসার স্বয়ং নগর পরিষদের সভ্য ছিলেন না বটে, তথাপি তিনি ছিলেন বিদ্রোহী মুহ্লহসেনে দুর্গের নেতৃত্বদানকারী শক্তি (guiding spirit)। সেন্ট মেরী গার্জার লাদপীঠ হতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন “প্রত্যেক মানুষ মুক্ত এবং সকলেরই আছে সমান অধিকার।” তাঁর আবাসগৃহ পরিণত হয়েছিল বিপ্লবের কেন্দ্রীয় দপ্তরে। এখান হতেই পত্রাদি ও ঘোষণাসমূহ চতুর্দিকে প্রচারিত হতে থাকে, কারণ একটা স্থানীয় কৃষক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা তাঁর নিকট ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় সঙ্কীর্ণ মানসিকতাকে অতিক্রম করতে এবং সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ৩০০ অনুগামীর পুরোজাগে তিনি ক্রাঙ্কহসেন্ অতিমুখে ঘাড়া করলেন, সেখানে ১৫২৫-এর ১১ই মে তিনি প্রিরিয়ার বিদ্রোহী কৃষক, সাধারণ মানুষ আর বণিকদের লিবিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি তাদের সমাবেশ ঘটালেন যাত্রা তখনও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি এবং তিনি পুনরায় তাঁদের বিপ্লবী কর্মে আহ্বান জানানলেন। কিন্তু মাত্র তার চার দিন পরের ঘটনা, রাজত্ববর্গের সম্মিলিত বাহিনীর কামানের গোলাবর্ষণ, অভ্যুত্থাত্রীর বিরুদ্ধে তাঁর পুত্র বলিষ্ঠ সর্বশেষ ভাষণে বিঘ্ন ঘটাল। উদ্বৃত্ত সেনাবাহিনী মুয়েনৎসার সমাজ-প্রগতির চিন্তাধারাকে তাঁর ৬০০০ অনুগামীর সঙ্গে নিমজ্জিত করল। ক্রাঙ্কহসেনের প্রবেশ পথের সম্মুখে অনুষ্ঠিত জাঙ্গারগের মুখে রাজন্যবাহিনী তাদের মাত্র ৬ জন লোককে হারাল। ছয় হাজার বিদ্রোহী কৃষক হলো বন্দী যাদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং মুয়েনৎসার। তাঁর জীবনের আর ১২টি দিন অবশিষ্ট। তিনি সবে ৩০

## বিপ্লবী চিন্তাধারা

মুদ্রেনংসারের সংগ্রাম, তাঁর ব্যর্থতা সত্ত্বেও এক ঐতিহাসিক আলোক দিশারী ঘটনা, যা প্রমাণ করেছে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অবিনশ্বরতাকে। জার্মানীর কৃষক সংগ্রাম তাঁর ক্যালভিনিজম-এর দ্বারা যেমন একদিকে ইংলও ও নেদারল্যান্ডের পরবর্তী বুর্জোয়া বিকাশের ধারাকে, তেমনি অপরদিকে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে বহুলাংশে অনুপ্রাণিত করেছিল। ফ্রান্সের কৃষক অভ্যুত্থানের সামনে, বোহেমিয়ার হুসাইটদের কাছে, হাজেরীর কৃষক সংগ্রামের কাছে এবং স্টেলান রেজিন্স ও অন্যান্যদের দ্বারা পরিচালিত রাশিয়ার কৃষক অভ্যুত্থানের সামনে জার্মানীর কৃষক সংগ্রাম এক নিদর্শন রেখেছিল।

জার্মানীর কৃষক সংগ্রামের বিদ্রোহী নেতা টমাস মুদ্রেনংসার রূপ পেয়েছিলেন এক শ্রেণীবৈষম্যহীন সমাজের, যেখানে থাকবে সকল যেহনতী মানুষের ঐক্য। তাঁর মে স্বপ্ন তখন বাস্তবায়িত হতে পারে নি; কারণ না সে সমর, না সেদিনের সে জনগণ—তাঁর উপযুক্ত। এইখানেই এই বিপ্লবের ট্রাজেডি। কিন্তু তাঁর চিন্তাদর্শ তাঁদেরই উত্তরাধিকারের একাংশে পরিণত হয়েছে যারা আনবেন হুনিয়ার বৃকে পরিবর্তন।

অনুবাদ : মন্মদী নেম

( নিউ পার্সপেকটিভ ( ১৯৭৫ ) থেকে পুনর্দ্রুত )—

## আলোচনা

### আগস্ট আলোচন ( ১৯৪২ ) এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি : কয়েকটি অন্তিমত

[ এক ]

১৯৪২ সালের ভুলের প্রকৃতি  
গঙ্গাধর অধিকারী

প্রাক স্বাধীনতা পর্বের কোন আন্দোলনোচ্চনামূলক বিশ্লেষণের মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। কিন্তু ১৯৪২-এর মারাত্মক ভুলগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাকিস্তান ও মুসলিম লীগের প্রায়ে আমরা যে মারাত্মক ভুলগুলি করেছিলাম এবং ধর্মঘট ও কৃষক আন্দোলন বিরোধী যে অবস্থান আমরা গ্রহণ করেছিলাম তার ফলে সাধারণভাবে এই পর্বটিকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ভুলের পর্ব বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তবে প্রধান ভুল, যা থেকে এই দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ভুলগুলির সৃষ্টি হয়েছিল, তা' হ'ল ১৯৪২-এর জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত গৃহিভঙ্গী।

জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের গৃহিভঙ্গীর এবং জাতীয় বুর্জোয়া ও জাতীয় নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের অবস্থানটির যদিও আমরা সংশোধন করেছিলাম, কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়াদের অভ্যুদয় ও বিকাশের এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের নীতির ক্রমবিকাশের কোন বাস্তবানুগ অনুশীলনের দ্বারা আমরা সেই নীতির তৎপত্ত ভিত্তি প্রস্তুত করি নি। কাজেই সংকীর্ণ গৃহিভঙ্গী চলতেই থাকল; জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট একটি কৌশল বলে মনে করা হল এবং বামপন্থী শক্তিশালি বহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের অননিবার্য-ভাবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করার ধারণাটিও আমাদের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে রয়ে গেল। এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা হল না যে সংকট পঙ্কতির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিরোধগুলিও তীব্র হচ্ছিল, একেবারে ওপরতলার অংল সমেত সমস্ত জাতীয় বুর্জোয়ারা তখন কংগ্রেসকে সমর্থন জানাচ্ছিল কারণ জাতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

১৯৫৬ সাল থেকেই কংগ্রেস নেতৃত্ব অগ্রসর অবস্থান গ্রহণ করছিল। লাহোর প্রস্তাবের পরই করাচী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তারপর কংগ্রেস জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিল যা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরিকল্পনার একটি প্রতিলিপি প্রকাশ করেছিল—যা হ'ল বুর্জোয়াদের একটি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী কার্যসূচী। কংগ্রেস মুক্ত ও ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার, ক্রম ও চীন বিপ্লবকে এবং আবির্গমিত ও স্পেনের উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে সমর্থন করার এক আন্তর্জাতিক নীতি গ্রহণ করেছিল।

এর সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তব সংগ্রামের ক্ষেত্রে (কংগ্রেসের পক্ষ থেকে—অনুবাদক) আপোষমুখীন অবস্থান গ্রহণ করা চলেছিল—ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগ্রাম ও সংগঠনগুলি সম্পর্কে সক্রমতার মনোভাব, আর দেশীয় নৃশক্তি শাসিত স্বাধীনতাগণিতে বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামের বিরোধিতা। এর ভিত্তিতে নেতৃত্বের আপোষমুখীন নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে মুক্ত হওয়ার নীতিটি কঠোরভাবে অনুসরণ করার প্রয়োজন ছিল। এইসব বাস্তব সমস্যার অনুশীলনের ভিত্তিতে পার্টির একটি তত্ত্বগত ও মতাদর্শগত বিনিময় গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল যা আগের পরিবর্তনগুলির পরিপেক্ষিতে পার্টিকে জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব সম্পর্কে ঐক্য ও সংগ্রামের বহননীতিক সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ করত।

১৯৪০-৪১ সালে আমাদের পার্টি সাম্রাজ্যবাদী মুক্তের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনমুখে রূপান্তর সম্পর্কে যে অবস্থান গ্রহণ করেছিল, তা সঠিক। সাময়িকভাবে জাতীয় সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে বদলে গিয়েছিল। অবস্থাটি আরও পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যখন আমাদের দেশ জাপানী আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল এবং ব্রিটিশ সরকার প্রথমেই কংগ্রেস নেতাদের কারাগার থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু আমরা যখন ব্রিটিশ দাসত্বে আবদ্ধ, তখন কিভাবে দেশ ও জনগণকে আক্রমণকারীর হাত থেকে রক্ষা করা যায়? এই প্রশ্নটিই জাতির সামনে এসে হাজির হয়েছিল। একমাত্র স্বাধীন জনগণই ফ্যাসিবাদী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা করতে পারত।

যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা একটি প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরে সম্মত হত, এবং তারতকে—জাতীয় কংগ্রেসকে একটি জাতীয় সরকার গঠনের সুযোগ দিত কেবলমাত্র তবেই ভারত বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ফ্রন্টে, সোভিয়েত ইউনিয়নও যে ফ্রন্টে ছিল, সেখানে তার স্থান গ্রহণ করতে সমর্থ হত। জাতীয়

কংগ্রেস এট অবস্থানটিই গ্রহণ করেছিল এবং আমাদেরও যোগদান তাই ছিল। তখন আমাদের মতে আমাদের মধ্যে পার্থক্য কি ছিল? প্রলেভারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলা হয়েছিল যে প্রকৃত ক্যাসিবাদ-বিরোধীরা অবশ্যই নিঃশর্তভাবে এই যুদ্ধকে সমর্থন জানাবে, আর অন্যদিকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ক্যাসিবাদ-বিরোধী এই যুদ্ধে তার সমর্থনকে কঠোরভাবে শর্তাধীন করে তুলেছিল। ১৯৪২-এর দোড়ার মাসগুলিতে আমরা জাতীয় নেতৃত্বকে ক্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধে নিঃশর্ত সমর্থন ঘোষণার এবং জাতীয় সরকার দাবি করার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছি। পরে আমরা তাদের মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে, ক্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করতে এবং জাতীয় সরকারের দাবি জানাতে বলেছি। সাম্রাজ্যবাদীরা কংগ্রেসের প্রতি লীগের সাম্প্রদায়িক বিরোধিতাটিকে একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবিকে নাকচ করার কাজে ব্যবহার করছিল।

জাতীয় নেতৃত্ব যে শর্ত আরোপ করেছিল তা কি তারা ক্যাসিবাদের পক্ষ সমর্থন করেছিল বলে? জাতীয় বুর্জোয়ারা প্রধানতই ছিল ক্যাসিবাদ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং তারা ক্যাসিবাদকে সমর্থন করে নি। সাম্রাজ্যবাদ যখন তাদের জাতীয় সরকারের দাবীটিকে নাকচ করে দিয়েছিল তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের এই অবস্থান থেকে তারা “ভারত ছাড়” আন্দোলন শুরু করেছিল। স্পষ্টত এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় দাবি আদায়ের জন্য ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। অবশ্যই এই সংগ্রাম থেকে অত্যাধিকার হওয়ার মধ্যেই সম্ভাবনা ছিল যা জাপানী আক্রমণের পথকে সুগম করে দিত এবং প্রধানত ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য নেতৃত্ব এই ধরনের কার্যকলাপকে অবাধে বাড়বার সুযোগ দিয়েছে।

আমাদের নিঃশর্ত অবস্থান থেকে আমরা “ভারত ছাড়” আন্দোলনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করি এবং আমাদের মতটিকে একটি সংশোধনীর আকারে পেশ করি। আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে যখন জাতীয় নেতাদের ব্যাপকভাবে ধরপাকড় করা হল এবং তার ফলে প্রতিবাদ ধর্মঘট ও হরতাল সংঘটিত হল আমরা তখন তা থেকে দূরে সরে রইলাম। আমাদের বক্তব্য ছিল যে, এই আন্দোলন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে না, বরং এর ফলে ক্যাসিবাদের অসুস্থ অন্তর্ভুক্তমূলক ও পক্ষপাতবাহিনীর কার্যকলাপকে সাহায্য করবে যা

অজ্ঞাত হিসাবে ব্যবহার করবে। আমরা জাতীয় সরকার, এবং প্রতিরক্ষা আর জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য জাতীয় ঐক্যের প্রচারাভিযান শুরু করি।

আক্রমণের বিপদ যত বাড়তে থাকল এবং সংগ্রাম বিকাশলাভ করল, আমরা তা' থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলাম। প্রতিভুল আবহাওয়া সত্ত্বেও আমাদের পাঁচি ঐক্য বজায় রেখেছে, স্থির বিশ্বাস নিয়ে প্রচারাভিযান চালিয়েছে এবং বৈধকরণের সুযোগ নিয়ে জাতীয় ঐক্য ও জনগণের প্রতিরক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছে। আমাদের এই অবস্থান গ্রহণ পাকিস্তানকে সমর্থন, কঠোর ধর্মঘট বিরোধী ও কৃষক সংগ্রাম-বিরোধী অবস্থান গ্রহণের মত দাক্ষণ্যসূচী প্রতির সৃষ্টি করেছিল। এই পর্বের কিছু অবদান থাকা সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বাকী অংশগুলি থেকে আমাদের সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করে পাঁচির মারাত্মক ক্ষতি করেছিল এবং আমাদের গণভিত্তিকে বিভক্ত করে দিয়েছিল।

সাধারণভাবে স্বীকার করা হয়ে থাকে যে, ঐশ্বর্য দিনগুলিতে আমাদের এই অবস্থান গ্রহণ পাঁচির ক্ষতি করেছিল। এ কথাও স্বীকার করা হয়ে থাকে যে, আমাদের "জনযুদ্ধের" প্রোগান, পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের কঠোর ধর্মঘট-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী—পাকিস্তান সম্পর্কে আমাদের অবস্থান গ্রহণ এই সবই ছিল মারাত্মক ভুল। কিন্তু ভারত ছাড় আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, সেই আন্দোলনে আমাদের যোগ না দেওয়া সঠিক ছিল কি না, এই প্রশ্নটির কিন্তু মীমাংসা হয় নি।

এই প্রশ্নটি সম্পর্কে একটি মীমাংসায় আসা জাতীয় প্রয়োজন। আন্দোলন থেকে আমাদের সরে থাকার মনোভাব তৎসময়কার ও কৌশলের দিক থেকেও ভুল ছিল। জাতীয় কর্তৃত্বের নিরপেক্ষ ও নর্ত্তাধীন অবস্থানটি কি সুবিধাবাদী ছিল এবং ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল? অথবা মৌলভাবে অবস্থানটি ছিল ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, পরেরটি সঠিক (অর্থাৎ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী) আর সেজন্য একটি সমগ্র পটভূমিও ছিল। আমরা এমনকি নেতৃত্বকে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বলে সমর্থন করেছি আবার বলেছি তাদের এই আন্দোলন বিশৃঙ্খলক কলাকল সৃষ্টি করবে, আক্রমণের পথকে সুগম করে দেবে। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মুখে আমাদের সাধারণ সমর্থন ঘোষণা সঠিক ছিল। তাছাড়াও, আপনানী আক্রমণের

বিরুদ্ধে আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হবে, এই কথা বলাও আমাদের সঠিক ছিল।

কিন্তু জাতীয় আন্দোলন ছাড়া কি কমিউনিস্ট পার্টি দেশকে রক্ষা করতে পারত? একথা কল্পনা করা কি বাস্তবানুগ ছিল যে আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে দেশের জনসাধারণ জাতীয় নেতৃত্ব ফ্যাসিবাদের পক্ষে চলে গেছে বলে তাদের ত্যাগ করবে এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী-দেশপ্রেমিক কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলিত হবে? এই দুটি বস্তুবাট ছিল একেবারে অসম্ভব। অবশ্যতঃ অন্তর্ধাতকে প্রতিহত করার এবং কৃষক অঞ্চলগুলিতে প্রকৃত জনী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার, যা প্রকৃতপক্ষে আক্রমণকারীকে রুখতে পারত, একমাত্র পথ ছিল জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, তার বিরোধিতা করা নয়। জাতীয় আন্দোলনের এই আনর্তনের মুখে, সেই সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী, প্রলেতারিয়ন্স আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে আমাদের মতান্তর উপলব্ধি ও জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে সর্বত্র দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

জাতীয় আন্দোলন থেকে আমাদের চরম বিচ্ছিন্নতাকে যদি এড়ান যেত এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে আমাদের দক্ষিণপন্থী আন্তর্জাতিককে যদি এড়ান সম্ভব হত তাহলে কি হত এসব অনুমান করার চেষ্টা অর্থহীন।

এইটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমরা জাতীয় আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, -জননী এক বিশাল অংশের সমর্থনলাভ করতে পারতাম এবং আমাদের গণভিত্তি এতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হত না। এর ফলে আমাদের পার্টি বুদ্ধোত্তর বিক্ষোভ আন্দোলনে আরও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত এবং তাকে আরও বেশী মাত্রায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী করে তুলতে পারত। যদিও এই-কার্যক্রম দেশ ভাগ ও তার পরবর্তী বিপর্যয়কে প্রতিহত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না কিন্তু তবুও ক্ষমতা হস্তান্তরের পরবর্তী পর্বে আমাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে একেবারে নষ্ট করে দেওয়ার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে চূর্ণ করার কাজে আমাদের যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্য আরও লজ্জালম্বী অবস্থান গ্রহণ করতে পারতাম।

[ ছই ]

## জাতীয় প্রধান স্রোতধারা থেকে বাইরে

সি. রাজেশ্বর রাও

আমাদের নিম্নোক্ত দুর্বলতাগুলি যদি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখি যে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের পার্টির বিরাট আত্মদান সত্ত্বেও আমরা কোন কোন অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায়, যেমন ১৯৪২ সালে, প্রধান জাতীয় স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলাম। যখন পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং প্রগতিশীল মানবতার একমাত্র আশা সোভিয়েত ইউনিয়ন, নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত তখন তার প্রতি সর্বভাৱে সমর্থন জানিয়ে আমরা ঠিকই করেছিলাম। ঐতিহাসিকের সেট সন্দিক্ধে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামকে মুক্তি ও দাসত্বের ছনিষাজোড়া অতিকার সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেছিলাম।

কিন্তু সেই সঙ্গে যখন স্তালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের একেবারে অভ্যন্তর পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল তখন আমাদের আরও নমনীয় কৌশল গ্রহণ করা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আরও বাড়িয়ে তোলা উচিত ছিল। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, এই প্রেক্ষিতায় আমরা আমাদের দেশের প্রধান জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম।

পরে অবশ্য যুদ্ধের শেষের দিকে আমরা অভিমুখ ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর বীরদের পক্ষ সমর্থন করে, নৌব্রহ্মাহকে সমর্থন জানিয়ে এবং রাজস্বপ্রদায়ক বিরুদ্ধে সমবেত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অগ্রসর হয়েছিলাম।

( প্রিন্স পত্রিকায় প্রকাশিত রাজেশ্বর রাও-এর বক্তব্য থেকে : )

প্রিন্স. ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৫ )

[ তিন ]

## ফ্যাসিবিরোধী জনযুদ্ধ

১৯৪২-১৯৪৫

১৯৪১ সালের জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর হিটলার আর্হানির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ নতুন দিকে মোড় নেয়। তিনটি ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে একটি বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবিরোধী কোয়ালিশনের জন্ম হয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক যে জনযুদ্ধের যোগান দেয় তা সঠিক ছিল এবং ফ্যাসিবাদী শক্তিবর্গের পরাজয়ের পরবর্তী ঘটনাবলী তার পূর্ণ যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছে। কারণ বিরুদ্ধে মুক্ত করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক অসমসাহসিক মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকা পালন করে।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেয়। তারপর ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ক্রিপস মিশন আসে। কংগ্রেস নেতৃত্ব যুদ্ধের ফ্যাসিবিরোধী প্রগতিশীল চরিত্র লক্ষ্য করেন এবং ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে এ-আই-সি-সি সোভিয়েত, চীন ও ফ্যাসিবাদী দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেশগুলির প্রতি সংহতি জানায় ও শর্তাধীনভাবে যুদ্ধকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করে এবং “জাতীয় প্রতিরক্ষার জগৎ একটি জাতীয় সরকারের” দাবি জানায়। কিন্তু ব্রিটেনের অনমনীয় আচরণের ফলে ক্রিপস মিশন ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। বোম্বাই এ-আই-সি-সি বৈঠক (৭ই-৮ই আগস্ট ১৯৪২) বিখ্যাত ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং মহাত্মা গান্ধী ‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে’ যোগান ঘোষণা করেন—কিন্তু সংগ্রামের কোন পরিকল্পনা বা প্রগতি ছিল না। দূর্ভাগ্যবশত সাম্রাজ্যবাদ নেতৃবৃন্দকে প্রেরণ করে ২ই আগস্ট আঘাত হানে; এর বিরুদ্ধে ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে জনগণের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবার পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পশুশূলভ অত্যাচার চালায় আর সেই সঙ্গে কুংসা প্রচার করতে থাকে যে কংগ্রেস ফ্যাসিবাদের সমর্থক হয়ে গিয়েছে।

জনগণ বীরের মতো লড়ে; কিছু অংশ অন্তর্গত ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়ে সংগ্রামকে ফ্যাসিবাদমুখী করার চেষ্টা করে। কিন্তু মূলত এ সংগ্রাম পরিচালিত হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় দাবিদাওয়া আদায়ের জন্তে—প্রধানত এ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত গণবিস্ত্রোহ যা ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে

অঙ্গী গণ-প্রতিরোধের চরিত্র লাভ করেছিল। সরকারি রিপোর্টগুলি থেকেও সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুরতার কিছু পরিচয় মেলে; ১ই আগস্ট থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪২-এর মধ্যে ৬০-২২৯ জন ধৃত হন। আটক ছিলেন ১৮,০০০ জন এবং পুলিশ বা মিলিটারির গুলিবর্ষণে নিহতের সংখ্যা ছিল ১৪০।

বহু মাস ধরে পুরোনো পার্টি লাইনের কোন পরিবর্তন হয় নি। দেওলি বন্দী শিবিরে এবং অন্তর্গত জেলে বহু নেতা আটক ছিলেন, আর বাইরে থেকে গোপন পার্টিকেত্র কাজ চালাচ্ছিল। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে গৃহীত পলিটব্যুরোর এক প্রস্তাবেও সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধকে বিপ্লবী বুদ্ধে পরিণত করার ম্লোগানের পুনরাবৃত্তি করা হয়। তারপর পথ পরিবর্তনের প্রস্তাব করে একটি দলিল ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে দেওলি ক্যাম্পের বন্দী কমরেডরা পাঠান। ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে পলিটব্যুরো একটি প্রস্তাবে ঘোষণা করল: “ভারতীয় জনগণকে অন্তর্ভুক্ত গণসূচিকা পালনের উপযোগী করে তুলুন।” ১৯৪২ সালের জুলাই-এ সি-পি-আই-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং বন্দীদের মুক্তি দেওয়া শুরু হয়। মূল ম্লোগানগুলি ঠিক ছিল: “জাতীয় প্রতিরক্ষার সঙ্গে জাতীয় সরকার” ও “জাতীয় সরকারের সঙ্গে জাতীয় ক্রিয়”। ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটির বহির্ভূত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এবং পরের দিকে প্রথম পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাবের সঙ্গে আহুত ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ঐ লাইন বিস্তৃত রূপ লাভ করে। ১৯৪৩ সালের ২৩শে মে থেকে ১লা জুন বোম্বাইতে প্রথম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। তখন পার্টির সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫,৫৬০।

এই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ অবস্থার কাজের সুযোগ পেল। পার্টি দারুণ উৎসাহভরে প্রচার চালাতে লাগল—বুদ্ধের প্রগতিশীল চরিত্রের এবং দোষভরিত ইউনিয়নের মুক্তিদাতার ভূমিকা ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা ছড়িয়ে দিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তার কুসো প্রচার এবং তার চতুর কৌশলগুলির দ্রুত উদঘাটিত করল। পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম ঔপদ্রুকের প্রতিবাদ জানাল এবং এর বিরুদ্ধে জনসম্মুখিত করল। বহু কমরেড গ্রেপ্তার এবং কারাবদ্ধ হলেন। কায়ুর কমরেডরা লহীদের মতো মৃত্যুবরণ করলেন (১৯৪০)। এ ছাড়া পার্টি জাতীয় দাবি-দাওয়ার সপক্ষে এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে, সাম্রাজ্যবাদের

ভোটার সমর্থনে প্রচার অভিযান চালায়। জনগণের দাবি-দাওয়া ও জ্ঞানকার্যের পক্ষে পার্টি উৎসাহ সহকারে প্রচার করতে থাকে।

এই সময়ে যুদ্ধকে গণযুদ্ধরূপে সি-পি-আই'এর মূল্যায়ন সঠিক ছিল। সি-পি-আই এটাও সঠিকভাবে তুলে ধরে যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিশ্বব্যাপী ক্রান্তির অঙ্গীভূত করতে হবে। সঠিকভাবেই পার্টি জোর দিয়ে বলে যে, কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অগ্রগত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির জয়লাভই আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করবে। অত্রদিকে ফ্যাসিবাদের জয়লাভ সাধারণভাবে শুধুমাত্র গোটা দুনিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে বিপর্যয়ই সৃষ্টিত করবে না, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকেও পেছন দিকে ঠেলে দেবে। সঠিকভাবে জোর দিয়ে বলা হয় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বব্যাপী যিদ্ধ চাই, বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির সমর্থন চাই। অক্ষমতা অর্থাৎ জাৰ্মানি, ইতালি ও জাপানের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধের পক্ষে সুস্পষ্টভাবে দাঁড়ালে পরেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যাপ্ত পরিমাণে ঐ সমর্থন পেতে পারে। এটাই প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ ও দেশ-প্রেমিকতা-নিষ্ঠার সঠিক অবস্থান।

এটাও লক্ষণীয় যে, অনেক বড় বড় জাতীয় নেতা ও সাংস্কৃতিক জগতের ব্যাভিনামা ব্যক্তি ভারত-ভূখা বিশ্বের ভাণ্ডা-বিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করেন। জব্বারলাল নেহরু বারংবার ঘোষণা করেন যে, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও অগ্রগত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির পক্ষে। তিনি এ-পর্যন্ত বলেন যে, যদি জাপানী সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে সুভাষ বসু ভারতে আসেন, তাহলে তিনি তদ্বারি হাতে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবেন। যত্নশূন্যতার ন্যায়িত অবস্থার রক্ষাক্ষমতা ঠাকুর বারংবার সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান দেশপ্রেমিক প্রতি-রোধ সংগ্রামের সংবাদ জানতে চাইতেন। এমনকি ১৯৪২ সালের আগস্টে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় যে, সোভিয়েত ও চীনের প্রতিরোধ সংগ্রামে কংগ্রেসের সহানুভূতি আছে। আমাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ফ্যাসিবিরোধী মনোভাব বেশ তীব্র ছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি এই নতুন পর্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের সুনিন্দিত নীতিও ( অর্থাৎ জাতীয় প্রতিরক্ষার অন্তে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতীয়

ত্রিকোর নীতি) নির্ণয় করল। শুধুমাত্র এই নীতি রূপায়ণই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতিক সাহায্য করত।

এই সময়ে নিষিদ্ধ কাজকর্ম শুরু করে এবং ঠংরেজি ও ভারতীয় ভাষা-ভাষিতে পত্রপত্রিকা বের করতে শুরু করে সি-পি-আই জাতীয় ভিত্তিতে তার সংগঠন গড়ে তুলল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (আই-পি-টি-এ) প্রতিষ্ঠায় পার্টি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এটা প্রকৃত সাংস্কৃতিক নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯৩৩ সালের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্যে পার্টি বিপুল পরিমাণে ত্রাণকার্যে নেমে পড়ে এবং বহু অঞ্চলে গঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলে।

কিন্তু পার্টি জনস্বত্বের লাইন ব্যতিক্রমভাবে প্রয়োগ করে এবং ক্যাসিবিরোধী মুদ্রকে নিঃসর্তভাবে সমর্থন করার মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কর্তব্যের বখাৰ্থ সমন্বয় করতে ব্যর্থ হয়।

পার্টি সংগ্রাম ও ধর্মঘটবিরোধী এক লাইন গ্রহণ করে। গণসংগ্রাম পরিহার করে চলার একটি লাইন বের করা হয়। একেজে মুক্তি দেখানো হল যে, এ সংগ্রামভালি মুক্ত-প্রবাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে অথবা অন্তর্গত চাকানোর কাজে ক্যাসিবিদানী সমর্থকদের সহায়তা করবে (যঃ কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের রিপোর্টে এবং সাপ্তাহিক 'শিল্পস ওয়ার'-এর প্রবন্ধসমূহ)। একই ভিত্তিতে ভারত ছাড় আন্দোলনের বিরোধিতা করা হয়। ফরোয়ার্ড ব্লক ও মোজালিস্টরা, যারা কমিউনিস্টদের 'ব্রিটিশের চর' বলে আক্রমণ করে পাটোভাবে ভারতের 'পঞ্চম বাহিনী' ও 'ক্যাসিবিদানী চর' আখ্যা দেওয়া হয়। প্রথম পার্টি কংগ্রেসে বি টি রূপদিতের 'শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় প্রতিরক্ষা' নির্ধক রিপোর্টে বলা হয় যে উৎপাদন একটি 'পবিত্র দায়িত্ব' এবং উৎপাদনের প্রতি নর্তদাপেক্ষ সমর্থন একটা 'বাম-জাতীয়তাবাদী বিদ্যুতি' অতএব 'দৃঢ়ভাবে ধর্মঘট পরিহার করে চলা উচিত।'

কাজেই ১৯৪২-এর জুলাই হল :

(১) সংগ্রাম-বিমুখ ও ধর্মঘট-বিমুখ পন্থ গ্রহণ করা, যখন আমাদের যথাযোগ্য সাবধানতার সঙ্গে গণ-সংগ্রাম সংগঠিত করা এবং প্রয়োজনে ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত ছিল।

গিয়েছেন এবং যারা ভুলপথে পরিচালিত হয়ে বলেন যে, শত্রুর শত্রু আমাদের বন্ধু তাঁদের ভুলভাবে “পক্ষম-বাহিনী” আখ্যা দেওয়া।

(৩) মমনীর কৌশল গ্রহণে ব্যর্থ হওয়া, যেমন—পরে স্থালিনগ্রাম লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ যখন অনুকূল মোড় নিল, তখন আমরা ত্রিটিশের বিরুদ্ধে আরো সক্রিয় বিরোধিতা ও সংগ্রাম সংগঠিত করতে পারতাম এবং জাতীয় দাবিগুলির পক্ষে আরো কার্যকর চাপ দিতে পারতাম।

এই পথ গ্রহণ আমাদের বিচ্ছিন্ন করল, আমাদের পার্টির অবস্থান দুর্বল করল, এমনকি কোন কোন অঞ্চলে আমাদের পার্টির গণভিত্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। এটা আমাদের বিশ্বাসঘাতক ও ত্রিটিশের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে কুংসা করার কাজে কংগ্রেস ও সোশ্যালিস্ট নেতাদের হাতে একটা অস্ত্র তুলে দিল। এই কুংসা প্রচার সে সময়ে ফলপ্রসূ হয়েছে এবং পরেও যখন মুক্তোত্তর গণ-অভ্যুত্থানের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে একটা মুক্তফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা পার্টি করেছে তখনও গুরুতর ক্ষতি করেছে।

এই ভুলের মূল কোথায়? ডাঃ অধিকারীর ভাষায়, “জাতীয় আন্দোলনের এই মোড় নেওয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের ভুল অবস্থান গ্রহণের উৎস হচ্ছে প্রান্তিকারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে গোড়ামিপূর্ণ ধারণা ও জাতীয় ধনিক-স্রাবীর সম্পর্কে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী।”

( Guidelines of Party History,  
C. P. I. Publication Pp.—62-66. )

## এই সমালোচনা

**আমার ডায়েরি থেকে :** ম্যাক্সিম গোর্কি ।

অনুবাদ ও সম্পাদক শ্রীল জ্ঞান । ডিমাই পৃষ্ঠা

২৪২+৬ । প্রকাশক : আনন্দ অধিকারী, ৪৯

এম, সুইনহো লেন, কলকাতা-১৭ । পরিবেশক

বুক মার্ক । দাম পনেরো টাকা ।

একই লোকের দৃষ্টিতে যে দুগুণে দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কাজ চলতে পারে, গোর্কির লেখা না পড়লে তা বোকা যার না । মানুষের জীবনকে তিনি যেমন দেখেছেন তাঁর অস্ত-দৃষ্টি দিয়ে তুলতুল করে, তেমনি জীবনের ব্যাপ্তিও ধরা পড়েছে তাঁর সংবেদনশীল মানসপটে । তাই সামান্য অসামান্য, পূর্ণ অপূর্ণ, সম্ভব অসম্ভব সব কিছু নিয়ে এক একটা গোটা মানুষ অপূর্ণ রূপ পেয়েছে তাঁর কলমের অঁচড়ে । গোর্কির সাহিত্য এই কারণেই বৈচিত্র্য নিয়ে এক সামগ্রিকতার আধার । গোর্কির সাহিত্যের আর একটা বৈশিষ্ট্য নিঃসর্গের সঙ্গে মানবজীবনের নৈকট্যকে বিশেষ দান । প্রকৃতি ও মানুষ যেন হাত ধরাধরি করে চলেছে । একটি থেকে অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন করলে দুটিই যেন অসম্পূর্ণ অস্পষ্ট হয়ে যায় ; গোর্কির দেখা মানুষ বা সৃষ্ট চরিত্রগুলির সেই সজীবতা ও বর্ণাঢ্যতা আর থাকে না । গোর্কির হাতে পড়ে নিঃসর্গ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ; তাঁর জড়ত্ব যেন ভুঁচ য় । মনে হয় মানুষের মতোই সে সজ্ঞমান, সক্রিয়, অনুভূতিপ্রবণ আর চেহালা । নিঃসর্গ ও মানবপ্রকৃতির এই সাক্ষীকরণ গোর্কিসাহিত্যে এক আত্মদর্শনীয় কার্যকর বাস্তবতা যা যে-কোন মহৎ সাহিত্য ছাড়া অস্তিত্ব হার'ড ।

ম্যাক্সিম গোর্কির “আমার ডায়েরি থেকে” বইটি পড়তে পড়তে তাঁর এই অসামান্য শিল্পসৌকর্যের কথাই বাবুবার আমার মনে আনাগোনা করছিল । গোর্কির সাহিত্যের রাজনৈতিক দিকটা নিয়ে আমাদের দেশে যতটা আলোড়ন ও আলোচনা হয়েছে, তাঁর শিল্পনৈপুণ্য নিয়ে ততটা বিচার-বিশ্লেষণ হয় নি বলেই আমার ধারণা । সাহিত্যিকেরে তাঁর বৈপ্লবিক চেতনা বিশ্বকরকর সন্দেহ নেই ; কিন্তু শিল্পকর্মে উন্নত না হলে তাঁর মলা কতটা চমকো

বা থাকত বলা যায় না। বিদ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লেখা এমন সাহিত্য অনেক আছে যেগুলোর ভাৎক্ষণিক মূল্য যথেষ্ট থাকলেও কালোত্তীর্ণ সাহিত্যের ভাঙারে তার স্বীকৃতি নেই। গোকি মূলত ছিলেন সাহিত্যিক। তাই সৃষ্টিতে তিনি কখনো শিল্পশৈলীকে অবহেলা করেন নি। উনবিংশ শতকে রুল দেশে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক চেতনার উদ্ভূত হয়ে যাঁরা ক্লাসিক সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদেরই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গোকি বিংশ শতকে সৃষ্টি করলেন সমাজতান্ত্রিক চেতনার নয়া ক্লাসিক। শিল্পকর্মে ও ভাবসম্পদে ক্লাসিকের গুণে গুণায়িত বলেই গোকির সাহিত্য কালোত্তীর্ণ ও বিদ্যমান।

বৈপ্লবিক চেতনার উত্তরণের আগে ভ্রাম্যমান জীবনে গোকি রুল জীবনকে দেখার ও বোকার চেষ্টা করতে গিয়ে যে রোজনামচা লেখেন তা থেকেই নির্বাচন করে এই “আমার ডায়েরি থেকে” সংকলন গ্রন্থের প্রকাশন। এতে কোন বৈপ্লবিক চেতনা বা বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। সামনে থেকে শুধু জীবনকে দেখা আর দেখা শিল্পীর মন নিয়ে। দেখা মানুষগুলি যেন তাঁর সেই মনের মুকুরে অবিকল প্রতিফলিত। অধিকাংশই আর আমলের ছন্নছাড়া ভাবধুরে মানুষ। কি বিচিত্র তাদের খেয়াল, কি অদ্ভুত তাদের হাবভাব ও চালচলন! তাদেরই মধ্যে যেন এক এক কলক আলোর বিচ্ছুরণ দেখতে পেয়েছেন তিনি। আপাতদৃষ্টিতে যাদের এক মুঠো ছাইয়ের বেশি মূল্য আছে বলে মনে হয় না তাদেরই মধ্যে যেন কোথার আখির যন্ত্রণার অনুভূতি! আঁচরণ বিসদৃশ, চিন্তা অঙ্গলগ্ন, বাক্য সঙ্গতিহীন—কিন্তু তারও মধ্যে মানবাত্মার ক্ষীণ স্পন্দন। গোকি এখানে নিরাসক্ত দর্শক মাত্র। আশ্চর্য এই পর্যবেক্ষণ অভীক্ষা! এ দর্শনে গোকির মনোবৃত্তি নেই, আছে তদ্রূপতা। অমৃত হলোহল বাই উঠুক জীবনরস তিনি পান করবেন। জীবন সাধনার তাই তিনি উদ্যত। নিজের মনের রঙে রাঙিয়ে দেখার অভিপ্রায় তাঁর নেই। এখানে তিনি দ্রষ্টা নন, দ্রষ্টা মাত্র। অথচ এরই মধ্যে তাঁর সৃজনশীল মনটি কাজ করে গেছে। তাই এই রোজনামচার সমষ্টি এনে দেয় এক অনায়াসিত স্বাদ যা গোকির অস্বাভাবিক সৃষ্টি থেকে স্বাদে ও বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র।

আগুন নিরেই যে মানুষের কত রকম খেয়াল থাকে, এই রোজনামচায় তার বিবরণ পড়তে পড়তে স্তম্ভিত হতে হয়। কেউ আগুন লাগিয়ে তামাসা দেবে; সেটা তার নেশা। কেউ ভাগ্য পরীক্ষার অগ্নে আগুন দেখলেই তাতে

যেতে পারে। আবার আছে খনের নেশা। একদা একজন অনিচ্ছাকৃতভাবে একটা খুন করে বসেছিল। সেই থেকে সে খুন করে চলে। অথচ খুন সে করতে চায় না, তার অন্তে তার অনুতাপও আছে, কিন্তু সে খুন না করে থাকতে পারে না। আবার পাঁচ আয়গা থেকে ডবঘুরেরা এসে জুটেছে এক জায়গায়। বিচিত্র তাদের চালচলন, বিচিত্র তাদের ধরনধারণ। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই, অথচ তারও মধ্যে কোথাও যেন একটা বন্ধন রয়েছে। আবার অশ্রু দেখা হয় এক ছন্নছাড়া বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে। সে রূপ জাতিতে নিবেছে তার নিজের মনের ছকে গড়ে। তবুও আওড়ায়। অশ্রুর ওত ও মুক্তিতে তার বিষয় বিড়ম্বা। হাসপাতালে এক যন্ত্রা রোগীর প্রতি নাসের গভীর প্রেমও এক বিচিত্র অভিজ্ঞা গোফির। ইহুদী বিরোধিতা, বিদ্রোহী চিন্তাধারা, স্বপ্ন-বিলাস, বিপ্লবের টুকরো ছবি, হতাশা প্রভৃতি কত কিছই না দেখেছেন তিনি চোখে দেখা মানুষগুলোর মধ্যে। যেন মানুষের বিরাট মিছিল—অথচ তাদের ডাবডালি আলাদা। যে জীবন নেপথ্যে পচনশীল, পর্দা সরিয়ে সোর্কি তাদেরই ওপর আলোকপাত করলেন। তিনি লিখেছেন :—“আমার চোখে রাশিয়ার এই মানুষগুলি বিশেষভাবে, অবিচ্ছিন্নভাবে, নানা গুণে গুণী এবং অসাধারণ। এ দুকতে আমার ভুল হয় নি। এমন কি, রাশিয়ার নির্বোধ মানুষগুলোও অন্তত এক ধরনের নির্বোধ তাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্যে—ঠিক যেমন এক এক ধরনের অলস মানুষের নিজস্ব এক এক ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে।”

মানুষ যখন একলা থাকে, লিও তলস্তয় প্রসঙ্গে, কবি আলেকজান্ডার ব্লক, চেকভ, কবি ব্লক ও মিলিওসজিনী প্রভৃতি এসঙ্গ অত্যন্ত চমকপ্রদ। বহু অজ্ঞাত হীরকখণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায় এগুলোতে। ত্রোয়িংকি পুলের ওপরে তরুণীর ছোট্ট ছুঁচালো গোলাপী জিভটা বের করে চাঁদকে ভেঙেচানো, সার্কাসের ভাঁড়ের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টুপি খুলে নিজের প্রতিবিম্বকে কুর্নিশ করা, জৈনিক প্রতিবেদীর টুপি দিয়ে সূর্যরশ্মি ধরে বারবার মাথায় চাপাবার প্রয়াস, ছোট্ট ওরুথের দিশির মুখ দিয়ে একটা মোটা লাল পেনসিল গলাবার অন্তে চেখেভের চেক্টা, একটা পিরগিটিকে লিও তলস্তয়ের দ্বিজ্ঞাসা—তুমি কি সুখী? ইত্যাদি টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো বড়ই কৌতুকপ্রদ। এ সম্বন্ধে লোকি বলেছেন : “মানুষ যখন একা থাকে, সে কি রকম আচরণ করে—এই সমালোচনা সম্বন্ধে আমি জন্ম জন্মেরিচি। তখনই আমার মনে হয় আমার

এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে যে, সে ‘পাপুল’—এ ছাড়া প্রকাশের আর কোন শব্দ আমি পাই নি।”

অস্বাভাবিক লিও তলস্তয়ের সঙ্গে পথে যেতে যেতে গোর্কির আলাপ, কবি আলেকজান্ডার ব্লকের সঙ্গে শিল্পসাহিত্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা, চেষ্টার সঙ্গে বৈঠকী মেজাজে আলাপের সময় গোর্কি সম্পর্কে লিও তলস্তয়ের ধারণার প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়গুলি কেবল চমকপ্রদই নয়, আমাদের দেশে অনেকেই তা অজ্ঞাত। চেষ্টা একদিন গোর্কিকে বললেন : “তুমি জানো, তোমার ওপরে তলস্তয়ের মনোভাব এত বদলে গেছে কেন? এ তাঁর ঈর্ষা। তিনি মনে করেন—মুসারিঞ্জিককে তিনি যতটা ভালোবাসেন, তার চেয়ে মুলার তোমাকে ভালোবাসেন বেশি।” তারপর চেষ্টা তলস্তয়েরই ভাষায় বলেন : “মুলার যে এর সঙ্গে এক আয়তায় থাকে, এ জেনেও আমার খারাপ লাগে। মুলারের পক্ষে ওটা খারাপ। গোর্কি একটা নির্দয় লোক।...গোর্কির আত্ম গোয়েন্দার আত্মা, ও যেন এসে পড়েছে কামানদের দেশে যেখানে সে নিজেকে বিদেই বলে মনে করে এবং তার নিজের দেবতার কাছে বিবরণ দাখিল করে। এবং তার দেবতা হলো একটা দানব, অর্ধেক ছাগল—অর্ধেক মানুষ অথবা কিসান মেয়েদের উপকথার সেই জলের অপদেবতার মতো একটা কিছু।”

চেষ্টা যখন লিও তলস্তয়কে বলেন, গোর্কি খুব দ্রব্যবান মানুষ তখন তার প্রতিবাদ করেন তলস্তয় এই বলে : “না, না, আমি তার সম্পর্কে সব জানি। তার নাকটা হাঁসের মত—কেবল অসুখী এবং নির্দয় মানুষদের নাকই এই রকম হয়। মেয়েরাও তাকে ভালোবাসে না এবং মেয়েরা হলো কুকুরের মতো—শব্দ শুনে ভালো লোক চিনে নেয়।”

এমন অন্তরঙ্গ কথা রোজনা মচা ছাড়া আর কোথায় পাওয়া সম্ভব! একপ অসংখ্য মনিমানিক্য ছড়িয়ে আছে “আমার ডায়েরি থেকে” গ্রন্থে। বইটি আগাগোড়া না পড়লে শুধু উদ্ধৃতি থেকে তার কতটুকুই বা আশ্বাসন করা যেতে পারে।

সাহিত্যিক বন্ধু খ্রীস্টীল জানা গোর্কির এই রোজনা মচার বঙ্গানুবাদে যত্নের স্ফুট রাখেন নি। সম্ভবত ইংরেজি তর্জমা থেকেই তিনি এর অনুবাদ করেছেন; কিন্তু পড়তে পড়তে যেন মুলারই স্বাধ পাওয়া যায়। গোর্কির লেখায় যে অনগ্র বিশ্লেষণ আর সাহিত্যাকৃতি বিদ্যমান, অনুবাদকর্মে মূল্যবান বা পূর্ণমাত্রার সত্যের সংরক্ষণ পেরেছেন। গোর্কি চিত্রিত অতীতের মনোভাবের সত্যসন্ধানী।

কেবল আভিধানিক অর্থে নয়, মানুষের জীবন থেকে শব্দ আহরণ করে তিনি ক্লান্ত ভাষাকে নতুন সম্পদে সমৃদ্ধ করেছিলেন আর সেই কারণেই তাঁর প্রকাশের স্বাধীনতা ও ভক্তি জীবনানুগ হয়ে ওঠে। তাঁর সেই অনুগম ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির সঙ্গর্গে কৃপান্তর অসম্ভব ভাষায় করা সহজকর্ম নয়। সুশীল জানা কেবল একজন কৃত্রিম কথোপকথনই নয়, সাহিত্যিকেরে তিনি সর্বজনীন। সাহিত্যের বহির্বাণী থেকেই তিনি বিদায় নেন না; অল্পের মহলেও তাঁর সত্যসত্য আছে আর অনাট কানাট সব জানা তাঁর। তাই এই অনুবাদকর্মে তাঁর মুসিয়ানা সুপরিচ্ছন্ন।

বাংলা ভাষায় গোবিন্দ সাহিত্যের একটি নতুন দিক উন্মোচিত করে সুশীলবাবু বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে যে ধর্মবিশ্বাসজনন হয়েছেন সেজন্যই বলাই বাহুল্য। পুস্তকের মুদ্রণ পারিশ্রমিক প্রদানসমীচীন। মুদ্রাকর-প্রমাদ থেকে বইটি প্রায় মুক্ত। বাঙালী পাঠকদের কাছে এমন একটি আকর্ষণীয় বই সমাপদ না পেলে তা হবে পরিভ্রমের বিষয়।

—দিগন্ত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

*Sunil K. Munshi : Calcutta Metropolitan  
Explosion—Its nature and roots : Peoples'  
Publishing House, New Delhi (pp 175 viii)  
Rs. 25.00*

কলকাতা শহর-সমস্যা নিয়ে ট্রান্স-বাসে, হোটেল-রস্তারায় আলোচনা প্রারম্ভ ঘটে। সেমিনার সিম্পোজিয়াম ভাে আছেই। বাস্তবিকই, ইংরেজ শাসনের পরে কলকাতা শহরের সমস্যা এত প্রকট হয়ে উঠেছে যে, কোনো আগন্তুক কলকাতার পর্যালোচনা করলে তার শব্দে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমস্যাসংকুলতা অনুভব করা সম্ভব। অধ্যাপক সুশীল মুন্সী সেই প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর কলকাতার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও আর্থ সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করে

- কলকাতা শহরের পত্তন হয়েছিল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের দৃষ্টির দ্বার্ষ্য এবং এমনই তার ধারা ছিল যে ভারী গমনোন্মত্ত হবার সময় থেকেই কলকাতা ক্রমশ সমতাবহুল হয়ে উঠেছিল। অধ্যাপক মুন্সী একথাটা বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন—বিদেশী শাসক ও কলকাতার সম্পর্ক ছিল প্রত্ন-ক্রীতদাস সম্পর্ক, যখন তাদের ব্যবসাবাগিলা প্রসারের প্রয়োজন দেখা গিয়েছে, তখনই কেবল ভারী কলকাতার জন্ম বরচ করেছে (পৃ: ১১০)। দীর্ঘকাল সরকারী অবহেলার জন্য স্বাধীনতাস্তর কলকাতার শহর-সমস্যা বাড়ার কারণ যেমন, তেমনই কলকাতার অস্তিত্ব যে একান্তই ঔপনিবেশিক ছিল, দিন দিন বেড়ে ওঠা কলকাতার শাহরিক সমস্যা তা সহজেই প্রমাণসিদ্ধ করেছে। শ্রী মুন্সী অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছেন যে, কলকাতা শহর ছিল ঔপনিবেশিক চৌকি আর তার চারধারের উপনগরীগুলি ছিল উপগ্রহের মতো বিপন্ন-মানবাহন-প্রশাসন শহর কেন্দ্র (পৃ: ৬১)। যখন কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক শোষণের প্রয়োজনে, তখন দেখা যাচ্ছে যে উপনিবেশবাদী প্রতীচোর শহরগুলি গড়ে উঠেছে শহর-গ্রাম সম্পর্কের সুসমগ্র ও সুসময়িত বিকাশে। তৃতীয় দুনিয়ার যে সব উন্নত দেশগুলি পরাধীন ছিল, সেই সব দেশের সঙ্গে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির শহর-সমস্যার তুলনা করা যায়, তাহলে এই সিদ্ধান্তের যথার্থ্য অনুভব করা যাবে।

লেখক বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থটিতে কলকাতা শহর-সমস্যার উৎস-সম্প্রদানে পরাধীন যুগে পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক বিকাশের প্রেক্ষাপটকে বেছে নিয়েছেন। অনেক তথ্য-পুস্তক-রিপোর্ট-গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর পরিচয়মূলক গ্রন্থটি লিখেছেন। আর্থনৈতিক অক্ষমীকরণের প্রকৃতি, উপনগরীগুলির শহর-সমস্যা প্রকৃতি আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়েও প্রবন্ধ লিখেছেন কলকাতার শাহরিক সমস্যা অনুধাবনের উদ্দেশ্যে এবং ওদনুযায়ী সমাধানের পথনির্দেশ করেছেন। কলকাতার সমস্যার সঙ্গে অজ্ঞানীভাবে জড়িত ভাঙ্গিরখী নদীর সমস্যা ফারাক্কা সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। সে দিক থেকে শ্রী মুন্সী কলকাতা সমস্যাকে যে ব্যাপক পরিপেক্ষিতে বিচার-প্রকাশ পেয়েছেন, এরকম দৃষ্টান্ত বিরল।

কলকাতা শহর-স্বাধীনতার মূল কারণ হিসেবে তিনি কৃষির মৃতপ্রায় অবস্থা ও এ রাজ্যের সাম্যিক শংরীকরণ স্তরের অভ্যন্তরীণতাকে দায়ী করেছেন সেই সঙ্গে গ্রাম ও শহরের বেকারীহারের জ্যামিতিকহারে হ্রদ, সাধিক শিল্প-বক্ষ্যাত্ব, এবং

জনসংস্কারকির কথাও কারণ হিসেবে বলেছেন (পৃ: ৫, ৮৭)। তাঁর সমস্ত প্রবন্ধগুলি এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রচিত অথবা ঐ সিদ্ধান্তমুখিন। এটা নতুন কথা নয়, আমাদের দেশের সৌধীন শহুরে-সমাজতত্ত্বজ্ঞা এটা নানা ভঙ্গিমায বলে থাকেন। শ্রী মুন্সী এ থেকে যে সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হয়েছেন, সেগুলিই আমাদের বিবেচ্য।

শ্রী মুন্সী দেখিয়েছেন কিভাবে ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলার পূর্বতন শহর-কাঠামোগুলি ভেঙে যেওয়া হয়েছিল, যা একদিকে ঔপনিবেশিক স্বার্থসেবা করেছিল, অপরদিকে বাংলার আর্থকাঠামোকে ধ্বংসের মুখে এনেছিল। একথা উপস্থাপন করতে গিয়ে 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ কলাকল' প্রবন্ধে মার্কস-কথিত কৃষি ও শিল্পের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও রজনীপায় দস্ত-কথিত কুটিরশিল্প ধ্বংসের ঔপনিবেশিক চক্রান্ত এই দুই অত্যন্ত বলে প্রতিপন্ন সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে এগিয়ে শ্রী মুন্সী অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে দেখিয়েছেন কেন উনিশ শতকে ২০টি বর্ধিষ্ণু শহরকে (যেমন পূর্বতন মালদহ, কালনা, কাটোয়া, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি) ব্রিটিশ শাসকেরা ভেঙে দিয়েছিল। এর কারণ আর কিছু নয়, ঐসব শহরগুলি যেসব ছোট ছোট শিল্প, হস্তশিল্প প্রভৃতির ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছিল, তা ছিল স্বনির্ভরতার দ্ব্যাতক আর ঔপনিবেশিক শাসন কোনরকম স্বনির্ভরতাকেই বরণান্ত করতে চায় নি অসুত আধুনিক শহরকেন্দ্রিক আর্থকোষে। পরিবর্তে যে শহরগুলি গড়ে তোলা হল, তা কেবল কলকাতার মতই, যাতে করে সম্পদলুপ্ত ঔপনিবেশবাদীদের পক্ষে অনায়াস হয়।

রত্নাবতী, ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর অথবা ঔপনিবেশিক শাসন-কালের শেষদিক থেকেই কলকাতা শহর সমগ্র্য হিসেবে দেখা দিল। শ্রী মুন্সী সেই সমগ্র্যতার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ধারণাসমূহের পর্যালোচনা করেছেন। মাকিনী কেতাবী ব্রাহ্মণ বৌদি বা হোসেলিংস-এর অনুপযোগিতা দেখিয়েছেন কলকাতার ক্ষেত্রে এবং কারণ হিসেবে ঐ একই কথা বলেছেন যে, ভারতে অনেক শহর-সমাজতাত্ত্বিক শহরীকরণ প্রক্রিয়াকে দুই শতাব্দীর অধিক কাল ঔপনিবেশিক অধীনতার মৌলিক ভিত্তিকে অস্বীকার করে প্রতীতির তত্ত্ব প্রয়োগ করতে চায় (পৃ: ৬৮-৬৯)। তাদের বিপরীতে ল্যাটিন আমেরিকার ই এক সিলভা ও এম ভি সোতোর সমীক্ষা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, অনুন্নত দেশগুলিতে বিদেশী প্রয়াস হল পশ্চাৎপদতাকে বজায় রেখে আধুনিকীকরণের প্রয়াস (পৃ: ৫৮, ৭১), যা

কলকাতা সমস্যার সঙ্গে অনেকটা সঙ্গতিপূর্ণ—যদিও কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাকে ইংরেজ শাসন অনুন্নত রেখে দিয়েছিল, একথাটা অত সহজভাবে বলা যায় না। প্রচলিত গল্পবগ্ৰাহী সমাজভাবিকদের কলকাতা সমস্যা নিয়ে যে গবেষণা-বিলাস, অব্যাপক মুসলী তা সম্বন্ধে পরিহার করেছেন এবং এটাই তাঁর উদ্দেশ্য ব্যতীত।

কিন্তু তাঁর প্রতিপাত বিষয়ের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু গ্রন্থ থেকে যায়। শ্রী মুসলীর প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি মৌলিক তথ্যের স্বীকৃতি নেই—তা হল তৃতীয় দুনিয়ার ভারত শিল্পের দিক থেকে সবচেয়ে উন্নত এবং কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল তার অগতম সান্ধ্য বহন করে। তাঁর বারবার মধ্যে কলকাতাকে অনুন্নত বলা না হলেও সেরকম ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এক জায়গায় তিনি বলেই ফেলেছেন : “কলকাতার শহর-ক্ষীতির অনুন্নয়নের ফলস্রুতি এবং এর একমাত্র প্রাক্তকার কৃষি উন্নয়ন, বহুসংখ্যক গ্রামীন শহরে কৃষি-শিল্প ও কৃত্যকের বিকাশ এবং সামগ্রিকভাবে এ অঞ্চলে অগ্রভিত্তি বিকাশ” (পৃ: ৮৯)।<sup>১</sup> একথা মেনে নেওয়া যায় না। শ্রী মুসলীর কিছু কিছু সিদ্ধান্তে এই বকম বারবার প্রজ্ঞাপাত খটেছে। তিনি যদি জনসংখ্যাভিত্তিকেরও একটা কারণ হিসেবে মনে করেন (পৃ: ৮৭), তাহলে বলতে হয় যে, জনসংখ্যাভিত্তিক কেন খটেছে, সে কথা অনুসন্ধানে তাঁর অনীহা। অবচে এ গ্রন্থের অগত তিনি কৃষির বক্ষ্যাত্তকে একটা কারণ হিসেবে খাড়া করেছেন। অবশ্র কৃষির বক্ষ্যাত্তকে শহর-ক্ষীতির কারণ স্বয়ংচালিতের মতো বলাটাও মেনে নেওয়া যায় না, কেননা কৃষিপ্রধান ভারতে শহর-সম্প্রতি গ্রামীন সম্পদের উত্ত্ব হিসেবে বিকাশলাভ করে, এটাও সত্য।

প্রবন্ধগুলির প্রশংসালভ যোগ্যতা সন্দেহ মনে হয়েছে যে, মার্কসবাদী সমাজ-বীকার সঠিক প্রয়োগ শ্রী মুসলীর চিন্তায় অনুপস্থিত। পুঁজিতাত্ত্বিক দেশগুলির সঙ্গে সমাজভাত্ত্বিক দেশগুলির শহরীকরণ বা শহর সমস্যার মৌলিক প্রভেদ তিনি যেমন দেখান নি প্রাসঙ্গিক আলোচনাও, তেমনই এ প্রভেদের কথা স্মরণে রেখে বিশ্লেষণপ্রয়াসী হননি। প্রসঙ্গত, সংশ্লিষ্ট সোভিয়েত গবেষকদের স্রুতিভিত্ত মতামত তুলে ধরছি, যাতে করে শ্রী মুসলীর বিষয়ে উপরোক্ত অভিমত অনুধাবন সহজ হয়।

\* V. M. Gokhman, “G. M. Lappo & Y. L. Pivovarov : Urbanisation and Its Impact on the Environment” in *Man Society and the Environment*, Progress Publishers: Moscow, 1975, p. 281.

“সমসাময়িক শহরীকরণ ৫০ দশকের বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত বিপ্লবের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত...”

শহরীকরণ প্রক্রিয়া সামাজিক উৎপাদন ও সামাজিক সম্পর্কের চরিত্রের বিকাশদ্বারা সামগ্রিকভাবে পরিবেশিত হয়ে আমাদের সময়ে পরিপার্শ্ব, শিল্প-সমূহের স্থাননির্ণয় ও সমাজের অত্যন্ত ক্রিয়াক্ষম প্রভাব বর্ডার, আর্থকাঠামো জনসংখ্যা বন্টন প্রকৃতি, জনতাত্ত্বিক সূচকসংখ্যাগুলি, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিক ধরন পরিবর্তিত করে।...

পুঞ্জিতাত্ত্বিক রাষ্ট্রগুলিতে শহরীকরণ সামাজিক সংঘাতে বুদ্ধিকারক মতঃফূর্ত প্রক্রিয়া। সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্রগুলিতে এই প্রক্রিয়া সক্রিয়ভাবে পরিচালিত এবং তার সুযোগসুবিধাগুলি সর্বাধিক মাত্রায় প্রযুক্ত, আর নেতিবাচক দিকগুলি যথাসম্ভব প্রশমিত।”

অধ্যাপক মুল্লী মার্কসবাদী হিসেবে পরিচিত হয়েও কেন যে এই মৌলিক দিকগুলি অবহেলা করলেন, তা বোঝা গেল না। এগুলি কেবল মার্কসবাদী নয়, অ-মার্কসবাদীর কাছেও বাস্তব বলে গ্রাহ্য হবার সম্ভাবনা—অবশ্য মার্কসবাদ-বিরোধীদের সম্পর্কে কিছুই জোর করে বলা যায় না।

সোভিয়েত গবেষকদের একটি কথা বলেছেন: “শহরীকরণ নিয়মিতভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে এক জটিল আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে অধিত হতনি, হয়েছে পরোক্ষভাবে ও কদাচ, নির্দিষ্ট সমস্যা-বিস্তেপণে।”\*

আমার মনে হয়েছে একথাগুলি মূলতঃ শ্রী মুল্লীর পক্ষে প্রযোজ্য। তিনি যেমন সঠিকভাবেই কলকাতা সমস্যার উৎস হিসেবে ঔপনিবেশিক শাসনকে দায়ী করেছেন, তেমনভাবে তিনি প্রবন্ধগুলি রচনার সময় স্মরণ রাখতে পারেন নি যে, স্বাধীনোত্তর কালে অনুসৃত পুঞ্জিতাত্ত্বিক পথ যা কিছু করেছে তা প্রধানত পুঞ্জিতাত্ত্বিক শোষণকে পুষ্ট করার জগুই। কলকাতা শহর-সমস্যা তাকেই ঘিরে। এ সমস্যা নিয়ে শোষণী সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় ছড়াছড়ি। শ্রী মুল্লী সেই গড্ডল প্রবাহে গা ড়াননি, কিন্তু তার বিকল্প পথটিও নিতে পারেননি। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত বিপ্লবের দ্বর্বার গতি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে শহরীকরণ প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়েছে, কিন্তু শহর-সমস্যা দেখা দেয় নি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব উন্নত পুঞ্জিতাত্ত্বিক দেশগুলিতে শহর-সমস্যা চারদিক থেকে উদ্বেগ জাগিয়েছে—কারণ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব

পুঁজিভিত্তিক কবর-খনক। এই বাস্তব সত্যকে অগ্রাহ্য না করে তিনি কলকাতা শহর-সমস্যার উৎস সন্ধানে বেরিয়েছেন। সেজন্য তাঁর উপনীত সিদ্ধান্তগুলি অবশেষে পুঁজিভিত্তিক চৌহদ্দির মধ্যেই রয়ে গেছে, সমাধানের পথ দেখাতে পারেন নি। ফলে তাঁর পরিশ্রমী, অধাবসাত্মী গবেষণা নিরুদ্দেশ যাত্রায় পর্যবসিত হয়েছে একমুখ থেকে, অথচ মার্কসীয় পন্থায় তিনি অনেক বস্তুনিষ্ঠ পথ দেখাতে পারতেন—যা তাঁর কাছে অসম্ভব ছিলনা, বরং স্বাভাবিকই ছিল।

চারুভদ্র রায়

## ভিঠিপত্র

সম্মানিত,

মূল্যায়ন

১৩৮৩-এর ১ম সংখ্যায় (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) রণেন সেনের “বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ার প্রথম স্তর” প্রবন্ধের ২৪ পৃষ্ঠায় একটু তথ্যগত ভুল রয়ে গেছে। ১৯২৯-এ এ আই টি ইউ সি-র অধিবেশন হয় নাগপুরে, কবিরহাট নয়। কবিরহাট অধিবেশন হয় তার আগের বৎসর, অর্থাৎ ১৯২৮ সালে। নাগপুরের অধিবেশনেই এ আই টি ইউ সি ঘির্বাচিত্ত হয়।

হিত

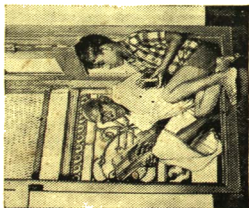
নবাসিনী

২০শে জুন, ১৯৭৬

টি এম সিদ্ধান্ত

টনিক থেকে বাই-ডুগ—

বন্ধ বন্ধ হৃদয়ের ঘামরা পারিবারিক বন্ধু



স্ট্রট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্—বন্ধ বন্ধ  
সেমবাসীকে যুগিয়ে চলেছে টংকুট ওষুধ

‘নতুন ঠিকার আসছে বন্ধ চেনা যার’—এ কেউ প্রবাস  
অন্যায়ী অশাসনের মাল্যই ক’রে নিতে পারেন। ওষু জনকরক  
ভাগবানদের কার নর, এসেছে রক্ত নক্ত গহ্বের কার  
হোটবু সকলেরই আশরা পারিবারিক বন্ধ। বড়ো ঠাকুরদার জনে  
যেমন বাই-ডুগ, তেমনি বাড়ন্ত শিশুর জন্যে টনিক—আমরা  
যুগিয়ে থাকি। তাহায্যও আমরা ঠিকি করি বিত্তর ধরনের আর্থনিক  
ওষুধ—সকলের সাধা কুসার এমন দায়ম।

এ কারে আমরা হাত নিই সেই সেই ১১৩৬ সালে।  
আমদান কয়েকজন বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ আর ভেষজবৃত্ত দেশের  
সাধারণ মানুষকে ওষু যোগাভেন বলে গড়ে তুলেছিলেন  
স্ট্রট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড।  
ওষুধের লবেষণা, উদ্ভাবন আর বিলিবাধার নিজেদের  
পায়ে দাঁড়ানো—স্ট্রট ইন্ডিয়া তাঁদের দ্রুত।

স্ট্রট ইন্ডিয়া  
ফার্মাসিউটিক্যাল  
ওয়ার্কস লিমিটেড,  
কলিকাতা ১৬

স্ট্রট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড আমদানের সেবায়

1976

CIPEC-PR 13 82N

